BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

নীললোহিতের অন্তরঙ্গ

শ্রাবণী ও প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে

১

সেই গল্পটা আশা করি সবারই মনে আছে? সেই মহাভারতে, যুদ্ধের পর—ভীষ্ম শরশয্যায় রয়েছেন, যুধিষ্ঠির এসে তাঁকে রোজ নানারকম প্রশ্ন করেন—একদিন প্রশ্ন করলেন, দাদামশাই, নারী এবং পুরুষ—এদের মধ্যে কার জীবন বেশি সুখের? (কী সময় কী প্রশ্ন! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, ভীষ্ম মরতে বসেছেন, তার ওপর পিঠে অতগুলো তীর বেঁধানো—এ-সময় তিনি বললেন নারী-পুরুষের সুখের কথা! তাছাড়া ভীষ্ম, যিনি সারাজীবনে কখনো কোন নারীকে স্পর্শ করেননি, তিনি ওদের সম্পর্কে কী জানবেন?)

কিন্তু দমলেন না ভীষ্ম। বললেন, প্রশ্নটা খুব জটিল বটে, কিন্তু এ-সম্পর্কে একটি আখ্যান আছে—তার থেকেই এর উত্তর পাওয়া যায়। পাঠকরা গল্পটা নিশ্চয়ই জানেন। আমি সংক্ষেপে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। পুরাকালে ভঙ্গস্বন নামে এক রাজা ছিলেন (হাতের কাছে মহাভারত নেই, নামটাম একটু ভুল হতে পারে—কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসেনা।)—একদিন তিনি শিকারে বেরিয়ে গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেলেন। তারপর তৃষ্ণার্ত হয়ে খুঁজতে-খুঁজতে এক জলাশয়ের কাছে এলেন—সেই পুকুরটা ছিল অপ্সরাদের স্নানের জায়গা—পুরুষের সেখানে আগমন নিষিদ্ধ, রাজা তো জানেননা—তিনি যেই পুকুরে নেমেছেন, অমনি তিনি স্ত্রীলোক হয়ে গেলেন। পুরোনো সব কথাও তাঁর মন থেকে মুছে গেল। অনুচররা রাজাকে খুঁজে না-পেয়ে ফিরে গেল, রাজা ভঙ্গস্বন এক রূপসী রমণী হয়ে থেকে গেলেন বনে। ক্রমে এক ঋষিকুমারের সঙ্গে দেখা হল তাঁর, দর্শন থেকে প্রণয়, প্রণয় থেকে বিবাহ। ঋষির বউ হয়ে আশ্রমে অরণ্যে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি। কয়েকটি ছেলেমেয়েও হল।

একদিন মহর্ষি নারদ খুঁজতে-খুঁজতে এসে দেখতে পেলেন। তাঁকে নারদ চিনতে পারলেন দিব্যদৃষ্টিতে। তিনি রাজাকে (এখন ঋষিপত্নী) বুঝিয়ে বললেন যে, তাঁর অভাবে রাজ্য ছারখারে যাচ্ছে—তাঁর আগের পক্ষের ছেলেরা ঝগড়াঝাঁটিতে মত্ত, সুতরাং তাঁর ফিরে যাওয়া উচিত। নারদ মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে তাঁকে আবার পুরুষ করে দিলেন।

আশ্রম ছেড়ে, এ-পক্ষের ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে ছেড়ে, রাজধানীতে ফিরে

এলেন রাজা। রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু মনে সুখ নেই তাঁর। নারদকে ডেকে রাজা বললেন,—আমাকে আবার রমণী করে দিন, রমণী অবস্থায় আমি যে সুখ ও আনন্দ পেয়েছি—তার তুলনায় পুরুষের জীবন তুচ্ছ! আমি আবার সেই ঋষির আশ্রমেই ফিরে যেতে চাই। সত্যি-সত্যিই, রাজ্য ছেড়ে আবার সেই ঋষির বউ হয়ে চলে গেলেন ভঙ্গস্বন। প্রমাণিত হল, নারীর জীবনই বেশি সুখের।

আমি প্রায়ই ভাবি—এখনকার দিনেও নারী-পুরুষের মধ্যে কে বেশি সুখী? এই নিয়ে যদি একটা বিতর্ক প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা যায়, তাহলে বুঝতে পারছি, মেয়েরা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে আসর সরগরম করে রাখবেন। প্রায়ই তো মেয়েদের মুখে অনুযোগ শুনি, আপনাদের ছেলেদের কী মজা! যখন যা খুশি করতে পারেন! জানি, সেই বিতর্কসভায় মেয়েরা প্রমাণ করে ছাড়বেন—তাঁদের জীবন নিতান্ত বিড়ম্বনাময়, পুরুষেরা তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব করে রেখেছে ইত্যাদি। পুরুষদের জীবনের সুখের প্রমাণ হিসেবে—তাঁরা বলবেন, পুরুষরা যখন যেখানে খুশি যেতে পারে, পুরুষরা টাকা উপার্জন করে, তারা দেশ শাসন করে, ইত্যাদি-ইত্যাদি। এর সবকটার উত্তরই আমি দিতে পারি—মেয়েদের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পারবনা, আড়াল থেকে।

আমার ধারণা, সব সভ্যতাই মাতৃতান্ত্রিক। পুরুষরা ক্রীতদাসমাত্র। তারা নির্বোধের মতন খেটে-খেটে মরছে, কিন্তু কৃতিত্ব ও মজাটুকু সব নিয়ে নেয় মেয়েরা। পুরুষরা টাকা উপার্জন করে ঠিকই, কিন্তু সেই টাকা খরচ করে মেয়েরা, অবহেলায়, বিলাসিতায় যা খুশি। পুরুষরা অকারণে যুদ্ধবিগ্রহ করে মরে, দুরন্ত নদীর ওপর ব্রিজ বানানো থেকে শুরু করে প্রাণ তুচ্ছ করে সিংহের সঙ্গে লড়াই পর্যন্ত—পুরুষদের এ-সবকিছুই কোন-কোন মেয়েকে খুশি করার জন্য। মেয়েরা এতেও খুশি হয়না, অবশ্য ঠোঁট উল্টে বলে, এ আর এমন কী, এ তো অনেকেই পারে। তুমি নিজে আলাদা বেশি কী পারো—তাই দেখাও! এই আলাদা হবার নেশা ধরিয়ে দেওয়াও মেয়েদের অন্যতম কৌশল। বেচারা পুরুষরা নদীতে ব্রিজ বানাবার পরেও আবার সমুদ্রে বাঁধ দিতে যায়, সিংহ হত্যা করার পর মানুষ হত্যায় মেতে ওঠে। ফরাসিরা বলে, 'শ্যারশো লা ফাম', মেয়েটাকে খুঁজে আনো—সব দুর্ঘটনার আড়াল থেকে সেই মেয়েটাকে খুঁজে আনো। দিল্লিতে থাকবার সময় একজন হাইকোর্টের বিচারপতিকে দেখেছিলাম আদালতে কী দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাঁর—কিন্তু বাড়িতে তিনি পাঞ্জাবি না ড্রেসিং গাউন পরবেন—স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া সেটুকু নির্বাচনের স্বাধীনতাও তাঁর নেই। মেয়েরা ইচ্ছেমতন যেখানে-সেখানে যেতে পারেনা বটে, কিন্তু ইচ্ছেমতন যখন-তখন যেখানে-সেখানে পুরুষদেব পাঠাবার ক্ষমতা তাদের আছে। যাও, পার্ক সার্কাস থেকে নিয়ে এসো মাংস, বাগবাজার

থেকে ইলিশ, বড়বাজার থেকে জর্দা—এসব হুকুম অবলীলাক্রমে বেরুবে তাদের মুখ থেকে। পুরুষদের চিন্তাভাবনা পরিকল্পনা এক নিমেষে বদলে দিতে পারে মেয়েরা। স্বামী ঠিক করেছেন ময়দানে মিটিং শুনতে যাবেন—স্ত্রী এসে বললেন, ওমা সেকি, আজ যে আমি সেজো মাসির বাড়িতে যাব—তাঁকে কথা দিয়ে ফেলেছি। এক বন্ধুর বাড়িতে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ নিয়ে আমরা তর্কে মত্ত, দেশ ও পৃথিবীর দুঃসময় নিয়ে বন্ধুটি অত্যন্ত চিন্তিত—বন্ধুপত্নী খানিকটা শুনলেন, বিরক্তভাবে হাই তুললেন, তারপর বললেন, দ্যাখো তো, অমুক হলে কী সিনেমা

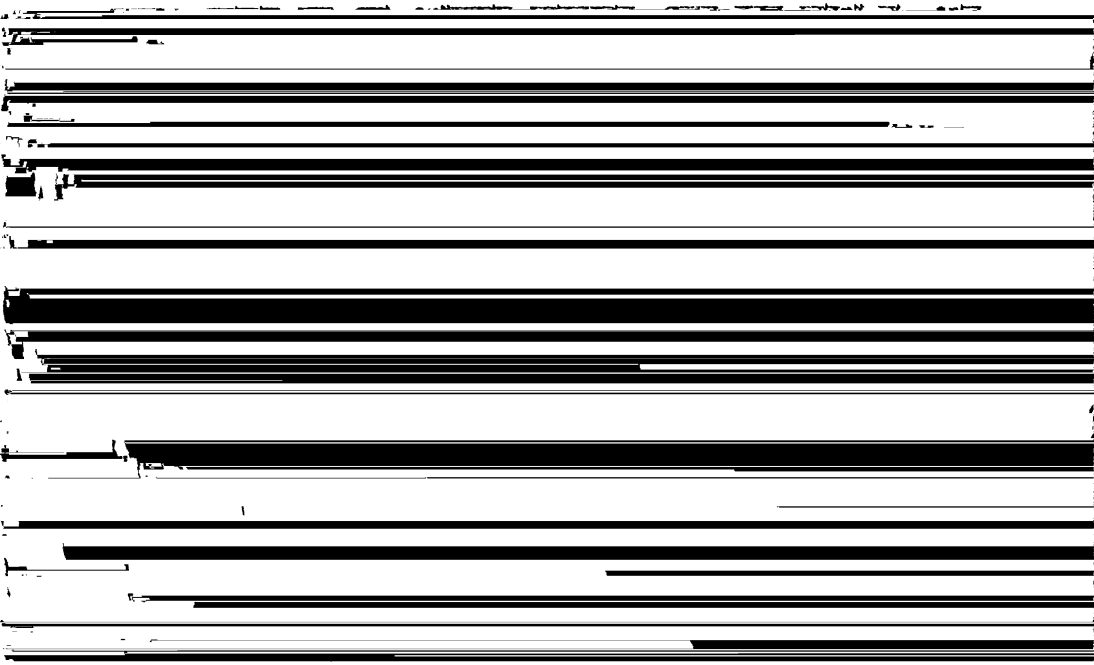

টিকিট পাওয়া যাবে কিনা! নিমেষে পৃথিবীর দুঃসময়ের কথা ফুৎকারে উড়ে গেল, আমরা ডুবে গেলাম, হিন্দি সিনেমার জগতে।

অন্যকথা থাক। আমি মেয়েদের কয়েকটি বিশেষ সুবিধের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথমেই বলা যায়, মেয়েদের দাড়ি কামাতে হয়না। এটা যে একটা কতবড়ো সুবিধে—মেয়েরা তা বুঝবেনা। ঝড়-বৃষ্টি-রোদ, ছুটির দিন, কাজের দিন—এই যে প্রত্যেকদিন দাড়ি কামাবার অসহ্য একঘেয়েমি—এর হাত থেকে নিস্তার নেই পুরুষদের। আমি পারতপক্ষে আয়নার সামনে যেতে চাইনা—কিন্তু দাড়ি কামাবার সময় আয়নার সামনে মুখ আনতেই হয়—তখন নিজেকে ভেংচি কাটি রোজ। ঠিক সময় ব্লেড কিনতে ভুলে গেলে পুরোনো ব্লেডে গাল ঘষার সময় ইচ্ছে করে নিজের গলায় এক কোপ বসিয়ে দিই। দাড়ি রাখব, মাত্র দু-তিনদিন দাড়ি না কাটলেই মেয়েরা এমন বিশ্রীভাবে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর মেয়েরাই যদি—দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়—তাহলে আর সে মুখের মূল্য কী?

মেয়েদের আর-একটা সুবিধে তাদের শাড়ির কোন সাইজ নেই। যে-যার শাড়ি

২

আমি ভাবছিলাম আমি কোন দলে? কোলিয়ারির অফিসঘরে বসে আছি। সকালবেলা ভারী ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েছে। চৌধুরি সাহেব খুব অতিথিবৎসল, তাঁর বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার এলাহি বন্দোবস্ত। সকালেই চায়ের সঙ্গে টোস্ট, বেকন, মার্মালেড আর খাঁটি ক্ষীর খাওয়ালেন, তারপর বললেন, চলুন আমার সঙ্গে। খনির মধ্যে নামবেন তো।

খনিতে নামার ব্যাপারে আমার খুব উৎসাহ। খনি অঞ্চলে বেড়াতে এসে একবার অন্তত ভূগর্ভের অন্ধকার না-দেখার কোন মানে হয়না। মৃত্যুর পর তো নরকে যাবই, সুতরাং তার আগেই একবার পাতালের কাছাকাছি ঘুরে আসা যাক।

চৌধুরি সাহেব এখানকার চারটে খনির এজেন্ট অর্থাৎ এই বিস্তীর্ণ এলাকার দণ্ডমুণ্ডের বকলম অধিকর্তা। মালিকের অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধি হিসেবে তিনিই এখানকার সব। একদিন আমার এক বন্ধুকে কথায়-কথায় বলছিলাম, আমার কিছুদিন খনি অঞ্চলে গিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে খুব। বন্ধুটি সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিলেন, চলে যা না। আমার এক মাসতুতো দাদার আণ্ডারে চারটে খনি আছে, চিঠি লিখে দিচ্ছি, চলে যা।

সেই চিঠি নিয়েই এখানে আসা। চৌধুরি সাহেব ব্যস্ত মানুষ, কোলিয়ারি ছেড়ে বাইরে প্রায় যাওয়াই হয়না—অনেকদিন পর শহরের লোক পেয়ে তিনি খুশি হয়ে ওঠেন। অমায়িক, হাসিখুশি মানুষ—সাহিত্য-শিল্পেও উৎসাহ আছে, শরীরটাও মজবুত।

খাদে নামব সব ঠিকঠাক মাথায় সাদা রঙের হেলমেট পরে নিয়েছি, কোমরেও চওড়া বেল্ট লাগানো, ব্যাটারি—হাতে জোরালো টর্চ—চৌধুরি সাহেব নিজে আমার সঙ্গে নামবেন, এমন সময় একটা দরপাল্লার টেলিফোন এলো। চৌধুরি সাহেব বললেন, তাহলে আর-একটু বসুন, আর-এককাপ চা খেয়ে নিন বরং, আমি টেলিফোনটা সেরে নিচ্ছি।

সেই থেকে আরও দেরি হয়ে গেল। টেলিফোন শেষ হয়েছে, এমন সময় আর্দালি এসে খবর দিল, সেই চারজন লোক আবার দেখা করতে এসেছে। 'সেই চারজন' শুনেই বিরক্তিতে চৌধুরি সাহেবের মুখ কুঁচকে গেল, বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, আর্দালিকে কিন্তু বললেন, যাও ডেকে নিয়ে এসো। আমার দিকে চোখের এমন একটা হতাশ ইঙ্গিত করলেন, যার অর্থ, আরও খানিকক্ষণ বসতেই হবে।

ভেবেছিলাম, হোমরাচোমরা কেউ হবে, কিন্তু সেই চারজনকে দেখে আমি

হতাশ হলাম। চারজন অতি সাধারণ গেঁয়ো লোক—একজন ছোকরা আর তিনজন বুড়ো, বুড়োদের মধ্যে একজনের গায়ে ফতুয়া আর চোখে গোল চশমা—নিকেলের ফ্রেম, বাংলা নাটক এবং সিনেমায় গ্রাম্য কুচক্রী বদমাইশদের চেহারা যেমন থাকে —সেইরকম। তারা এসে বলল, স্যার সেই জমির ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে এলাম।

চৌধুরি সাহেবের মুখের বিরক্ত ভঙ্গি তখন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেছে, হেসে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন বসুন, এই রঘুয়া, বাবুদের চেয়ার দে। চা খাবেন তো?

গোল-চশমা-বুড়োটি বিগলিতভাবে বলল, না স্যার। আপনি ব্যস্ত লোক, বেশি সময় নষ্ট করবনা—আমাদের সেই জমিতে জল ঢোকার ব্যাপারে...

চৌধুরি সাহেব বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেসব কথা হবে। আগে চা খান। চা খেতে আপত্তি কী! এই রঘুয়া—

আমি একপাশে চুপ করে বসে সিগারেট ধরালাম। লক্ষ করলাম দিনকাল সত্যিই অনেক বদলে গেছে। চৌধুরি সাহেব তিন হাজার টাকার মতন মাইনে পান, ফুলবাগান সমেত বিশাল কম্পাউণ্ড নিয়ে তার বাড়ি, ব্যক্তিগত ব্যবহারেব জন্য দুখানি মোটর গাড়ি। তাঁকে কেউ চৌধুরিবাবু বলবেনা, বলবে চৌধুরি সাহেব। ইসব সাহেবরা তো চিরকালই ঐধরনের গেঁয়ো লোকদের তুইতুকারি বলে কথা বলেছেন, হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা—এইসব আদরের সম্বোধন করেছেন। চেয়ারে বসানো? চা খাওয়ানো? স্বপ্ন বলে মনে হয়। শুধু যে চৌধুরি সাহেবই ওদের চেয়ারে বসিয়ে চা খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত, তাই নয়, ঐ হেঁজিপেঁজি গেঁয়ো লোকগুলোও কিন্তু চেয়ারে বসতে একটুও আড়ষ্ট বোধ করলনা, অবলীলাক্রমে চুমুক দিল চায়ের কাপে—একজন আবার আর্দালির দিকে চেয়ে বলল, আর-একটু চিনি দাও হে। ঠিক মিঠা হয়নি।

ধীরেসুস্থে চা শেষ করে তারা বক্তব্য শুরু কবল। গাযের অশিক্ষিত অর্ধনগ্ন লোক হলেও তেমনটি আর হাবাগোবা নেই, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে জানে —এমনকী দু-চারটে ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করে।

বৃত্তান্তটি এই। ওরা কোলিয়ারি সংলগ্ন গ্রামের চাষা। কোলিয়ারির বয়লার থেকে বিষাক্ত গরমজল ওদের জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে, তাতে জমিব ফসলই শুধু নষ্ট হয়নি। জমি একেবারে চাষের অযোগ্য উষব হয়ে গেছে। সেইজন্য ওরা কমপেনসেশন চায়। সেই জল পুকুরে পডায পুকুরের মাছও মরে গেছে। সুতরাং ওদের মহাসর্বনাশ, ওরা খাবে কী? ওরা ক্ষতিপূরণ চায়—তার অঙ্কও নেহাৎ কম নয়।

চৌধুরি সাহেবের বক্তব্য, গরমজল গড়িয়ে গেছে ঠিকই, সেই জল ফসলের

গোড়ায় লাগলে ফসলও মরে যেতে পারে—কিন্তু ঐ জল মোটেই বিষাক্ত নয়, ঐ জল শিশিতে ভরে ডিস্টিলড ওয়াটার হিসেবে বেচা যায় পর্যন্ত। সুতরাং জমি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথাটা বাজে, পুকুরে মাছ মরে যাবার কথাটা গুজব—এখন ক্যানাল কেটে দেওয়া হয়েছে—এখন সমস্ত জমির ওপর জল ছড়ায়না—এবং পুকুর পর্যন্ত পৌঁছুতে -পৌঁছুতে জল ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঐ জলকে বিষাক্ত বলার কোন মানে হয়না।

নিকেল-চশমা-বুড়ো বলল, না স্যার, জমির ঘাসগুলো পর্যন্ত একেবারে হলদে হয়ে গেছে। সেই ঘাস মুখে দিয়ে একটা গরু...

চৌধুরি সাহেব ওর বাক্যের মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বললেন, মরে গেছে তো? গরুটা ঘাস মুখে দিল আর ধপাস করে মরে পড়ে গেল। তাই না? শুনেছি আমি সে-গল্প। কিন্তু সেই মরা গরুটা কে দেখেছেন আপনাদের মধ্যে? কেউ দেখেছে?

—আজ্ঞা স্যার, গদাই—

গদাই বলেছে তো? জানি, তাও জানি। গদাইয়ের নিজের কি কোন গরু আছে? আপনাদের সারা গাঁয়ে একমাসের মধ্যে একটাও গরু মরেনি—আমি খবর নিয়েছি। গদাই তো বলবেই! সে অমুক পার্টির লোক—সে তো চায়ই সবসময় একটা হাঙ্গামা বাধাতে—সে আবার আজকাল লিডার হচ্ছে?

—তাহলে আমাদের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটার এবার একটা ফয়সালা করেন।

মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে চৌধুরি সাহেব এবার উঠে দাঁড়ালেন। বেশ আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন, আপনাদের যদি চাষের ক্ষতি হয়ে থাকে—তবে তার ক্ষতিপূরণ কম্পানি নিশ্চয়ই দেবে। স্থানীয় লোকের অসুবিধে করে কম্পানি ব্যবসা চালাবেনা। কিন্তু, আমি একটা কথা বলছি শুনুন। এই যে জমি নষ্ট হয়ে গেছে—এ-গুজব ছড়াবেননা। ঐ জমি আবার চাষ করুন। আমাদের দেশে এখন আরও খাদ্যের দরকার। আমি নিজের পকেট থেকে আপনাদের বীজ ধানের খরচা দিচ্ছি। বয়লারের জল আমি অনায়াসেই অন্যদিকে ঘুরিয়ে নদীতে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু আপনাদেরই চাষের সুবিধের জন্য ঘণ্টায় চারশো গ্যালন করে জল বিনাপয়সায় পাচ্ছেন—সেই জল পুকুরে জমিয়ে যদি সেচের কাজে লাগান—

—ও-জল কেউ ছোঁবেনা। সবাই জানে, ওতে বিষ আছে।

—বিষ আছে? চলুন আপনাদের সঙ্গে আমি যাচ্ছি—আমি নিজে আপনাদের সামনে সেই জল খেয়ে দেখাব কেউ মরে কিনা—আমারও তো প্রাণের দাম আছে? নাকি নেই?

—গাঁয়ের লোকে আমাদের পাঠিয়েছে, আপনি ক্ষতিপূরণের টাকাটার কথা বলুন স্যার। ও-জমিতে আর ফসল হবেনা—মেহনত করে রক্ত সব ঘাম করে

ফেললেও কিছু হবেনা—

ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোরালো। আমি বাইরের লোক, আমার কোন কথা বলা উচিত নয় বলেই আমি চুপ করে রইলাম। মনে-মনে ভাবতে লাগলাম, আমি কোন দলে? কোন পক্ষ আমি সমর্থন করব? চৌধুরি সাহেব যে যুক্তি দেখাচ্ছেন, তা কি পুরো সত্যি? কমপেনসেশনের কথাটা এড়িয়ে গিয়ে তিনি ভাব দেখাচ্ছেন যেন তিনি ওদের উপকার করার জন্যই ব্যগ্র। কিন্তু কোথাও একটা গোলমাল আছে। কমপেনসেশনের টাকা একবার দিলে কি বার বার দিতে হবে? জল সরাবার সত্যিই কি অন্য উপায় আছে? এ-কথা ঠিক, চৌধুরি সাহেব কোম্পানির স্বার্থ টেনেই কথা বলবেন। কোম্পানি তাকে তিন হাজার টাকা মাইনে দিচ্ছে কি এমনি-এমনি? লোকগুলোকে আপনি বলা, চা খাওয়ানো—এ সবই হয়তো কৌশল, সহজে কাজ হাসিল করার চেষ্টা। একটা জটিল সমস্যার সহজ মীমাংসা করতে পারলে তিনি মালিকের কাছ থেকে বাহবা পাবেন—সেইজন্যই কি দেশের খাদ্যসমস্যার উল্লেখ করে তাঁর গলায় ওরকম আবেগ ফুটেছে?

আমি চৌধুরি সাহেবের পক্ষে নই। চৌধুরি সাহেব দেখছেন মালিকের স্বার্থ। যে-মালিক নিষ্কর্মাভাবে রাজস্থান বা গুজরাটে বসে থেকে মোটা মুনাফা ভোগ করছে। আমি কেন তার পক্ষে যাব? চৌধুরি সাহেবের আত্মীয় আমার বন্ধু, তার চিঠি আমি নিয়ে এসেছি—এবং আমি লিখিটিখি শুনে তিনি আমাকে খাতির করছেন। কিন্তু বিনা সুপারিশে যদি আসতাম, উনি আমাকে নিশ্চিত পাত্তাই দিতেননা। আমি একজন সাধারণ লোক—আমি কেন ঐ বুর্জোয়াদের পক্ষে যাব?

আমি কি ঐ গ্রাম্যলোকগুলোর পক্ষে? তাতেও আমার মন সায় দিচ্ছে না। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বয়লারের জলকে বিষাক্ত বলা ওদের ইচ্ছাকৃত গুজবরটনা। গরু মরার খবরটা মিথ্যে। লোকগুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়—ওরা অলস আর ধূর্ত। খেটে খাব শ্রমের যথার্থ মূল্য চাইব—এরকম কোন মনোভাব ওদের নেই। এখানকার জমিতে কঠিন পরিশ্রম করে ফসল ফলাতে হয়—সেই পরিশ্রম এড়াতে চাইছে। গ্রামের সরল, নির্যাতিত চাষা এদের কিছুতেই বলা যাবেনা। আবার জমি চাষ করলেই যদি প্রমাণ হয়—জমি নষ্ট হয়নি—সেইজন্য চাষের কথা তুলতেই চাইছেনা। ভাবখানা এই, এজেন্ট সাহেবকে এবার খুব প্যাঁচে পাওয়া গেছে—ওঁর কাছ থেকে যতটা পারা যায় টাকা খিঁচে নিয়ে তারপর পায়ের ওপর পা দিয়ে খাওয়া যাবে! যদি রাজি না হয় তাহলে আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘটের ভয় দেখালেই হবে। না, ঐ নিষ্কর্মা মতলববাজগুলোর পক্ষ সমর্থন করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি কোন দলেই যেতে পারবনা। আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, মাঝখানে ঝুলে

থাকাই আমার নিয়তি। আমার বুকের মধ্যে একটা অপ্রয়োজনীয় বিবেক আর গুচ্ছের যুক্তি ঠাসা। সুযোগ পেলে, ঐ দুজনই আমাকে লাথি মারবে।

ধুত্তোর! এর চেয়ে খনিতে নেমে অন্ধকারে ঘুরলে অনেক বেশি ভালো লাগত!

৩

কী খাবেন বলুন? চা না কফি? আমি রীতিমতন চিন্তার ভান করে বললাম, উঁ, কোনটা খাওয়া যায়? কিছু কি খেতেই হবে? দুটোর একটাও যদি না খাই?

ঝর্না হেসে ফেলে বলল, আপনি না খেতে চাইলে কি আপনাকে আমি জোর করে খাওয়াব? কেন, কিছু খাবেননা কেন? ঠাণ্ডা কিছু খাবেন?

—ঠাণ্ডা মানে?

—স্কোয়াশ আছে। লেমনেড বা কোকোকোলা আনিয়ে দিতে পারি। যা গরম পড়েছে।

—না, না, ওসব নয়! গরমে গরম জিনিশই আমার পছন্দ। আচ্ছা, এক কাপ চা-ই দিন। শুধু চা কিন্তু, না থাক, বরং কফিই করুন। কিংবা চা—কোনটা তাড়াতাড়ি হবে?

—আপনি কোনটা খাবেন বলুন-না! কতক্ষণ আর লাগবে?

—আপনাকেই বানাতে হবে তো? না লোক আছে? তাহলে ওসব থাক না, এই তো বেশ বসে-বসে গল্প হচ্ছে।

—যাঃ, আপনি ঠিক করে কিছু বলতে পারেননা। দাঁড়ান চা করে আনছি। আমারও চা খেতে ইচ্ছে করছে!

ঝর্না চা করে আনতে গেল। গরমজল চাপিয়েই তার ফিরে আসার কথা। তারপর জল গরম হলে আবার গিয়ে চা ভেজাবে। কিন্তু এলনা। আমি উঁকি মেরে দরজার কাছে দেখলাম, ঝর্না হিটারে কেটলি চাপিয়ে কাপ-ডিস ধুচ্ছে। চা বানিয়ে ওর আসতে আরও চার-পাঁচ মিনিট লাগবেই।

আমি সতর্ক ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে গেলাম টেবিলের দিকে। টেবিলের ওপরেই চাবির গোছা পড়ে ছিল। আলমারির চাবিটা খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগল। তারপর আলমারির পাল্লায় যাতে ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ না হয়, সেইজন্য খুব সাবধানে নিঃশব্দে আমি আলমারিটা খুলে ফেললাম। এতক্ষণ চা-কফির নামে টালবাহনা করতে-করতে আসলে আমি মনস্থির করে নিচ্ছিলাম।

পাঠক নিশ্চয়ই আমাকে চোর ভাবছেন। তা ভাবুন, কী আর করা যাবে! অবস্থার গতিকে মানুষ কত কী করে!

ঝর্নার সঙ্গে আমার বন্ধু সুকান্তর বিয়ে হয়েছে। বছরখানেক মাত্র, তাও বিয়ের পর মাসখানেকের জন্য ওরা সাউথ ইন্ডিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিল, তারপর ঝর্না দুমাস ছিল পাটনায় ওর বাপের বাড়ি। সুতরাং ঝর্নার সঙ্গে ভালো করে আমার আলাপই হয়নি। এই তো কয়েকমাস মাত্র ওরা নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে গুছিয়ে বসেছে।

সুকান্ত যখন বাড়ি থাকেনা, সেই সময়টা জেনেই এসেছি। সুকান্তটা মহা ধুরন্ধর ছেলে, ও বাড়িতে থাকলে সুবিধে হবেনা। এখন ফ্ল্যাটে শুধু বাচ্চা চাকর আর ঝর্না। ঝর্না শুধু সুন্দরীই নয়, মনটাও খুব নরম। এই আমার সুযোগ। পাঠক, নিশ্চয়ই আমাকে চোর ছাড়াও অন্যকিছু ভাবছেন। তা ভাবুন, কী আর করা যাবে।

ঝর্না চা নিয়ে ফিরে আসার আগেই আমি আবার আমার জায়গায় ফিরে এসে বসেছি। আলমারি যথারীতি বন্ধ। চাবি আবার টেবিলের ওপর।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, অপূর্ব। অনেকদিন এমন সুন্দর চা খাইনি!

ঝর্না জিজ্ঞেস করল, চিনি ঠিক হয়েছে তো? আপনি কতটা চিনি খান জানিনা।

আমি বললাম, একেবারে নিখুঁত হয়েছে। এক-একজনের হাতই এমন থাকে যে সেই হাতে চা বানালে কতটা চিনি কতটা দুধ তার কোন প্রশ্নই আসেনা—

বাবারে বাবা! এই কথাটা যে ছেলেরা কত মেয়েকেই বলতে পারে!

—আপনাকে আগে কেউ এরকম বলেছে?

—বলেনি আবার!

—কিন্তু কথাটা পুরোনো হয়ে গেছে কি? শুনলে এখনো একটু-একটু আনন্দ হয়না?

ঝর্না হাসল। প্রসঙ্গ বদলে বলল, আপনার বন্ধুর কাছ থেকে আপনার অনেক গল্প শুনেছি, আগে খুব দেখা হতো আপনাদের দুজনের তাইনা? কই আপনি তো এ-বাড়িতে বেশি আসেননা।

—সুকান্ত আর চায়না যে আমরা এখানে বেশি আসি।

—যাঃ! ও বলেছে একথা?

—ঠিক মুখে বলেনি—কিন্তু এখন নতুনভাবে ঘরটর সাজিয়েছে, সুন্দরী স্ত্রী বাড়িতে—এখন আর ব্যাচিলর আমলের বন্ধুদের কেউ তেমন পছন্দ করেনা!

—মোটেই নয়। দাঁড়ান, ও আজ আসুক তো—আজ আপনার সামনেই ওকে জিজ্ঞেস করব। ও এক্ষুনি ফিরবে।

—এখন ফিরবে? এখন তো সাড়ে চারটে বাজে। সুকান্তর অফিস থেকে ফিরতে-ফিরতে সাড়ে ছটা-সাতটা হয়না?

—অন্যদিন তাই হয়, তবে আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে। আজ ইভনিং শো-এ একটা সিনেমায় যাবার কথা আছে।

সুকান্ত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে শুনে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, তাহলে আমি আজ চলি। আমার একটু কাজ আছে।

ঝর্না অবাক হয়ে বলল, এক্ষুনি যাবেন? ওর সঙ্গে দেখা করে যাবেননা?

—আজ আর না, আর-একদিন..

প্রায় দরজার কাছে চলে এসেছি, এইসময় ঝর্না আমার হাতের বইগুলো লক্ষ করল। জিজ্ঞেস করল, আপনার কাছে, ওগুলো কী বই? গল্পের বই আছে নাকি—অনেকদিন পড়িনি—

আমি একগাল হেসে বললাম, ও আপনাকে বলতে ভুলেই গেছি। দেখুন তো কী ভুলো মন আমার। এগুলো আপনাদেরই বই। সুকান্তকে বলবেন এগুলো আমি পড়তে নিয়ে গেলাম।

ঝর্নার মুখখানা কালো হয়ে গেল। লীলায়িত হাতে চূর্ণ অলক ঠিক করছিল, হাতখানা রয়ে গেলে সেখানেই। বলল, কোথায় ছিল বইগুলো?

আমি কিন্তু মুখের হাসি মুছিনি। বললাম, আলমারিতে, আপনি যখন চা করতে গিয়েছিলেন, তখন আপনাদের আলমারির বইগুলো দেখছিলাম। অনেকদিন ধরেই এই বইগুলো—

ঝর্না বলল, ও কিন্তু বইয়ের আলমারিতে কেউ হাত দিলে বড়ো রাগ করে। আমাকে স্ট্রিক্টলি বারণ করে দিয়েছে কারুকে বই দিতে—

সে কি আর আমি জানিনা। সুকান্তর স্বভাব এতদিন বাদে ঝর্না আমাকে বোঝাবে? এমনকী, বইয়ের আলমারির এককোণে ছোট্ট নোটিশ ঝুলিয়ে রেখেছে, 'আমার একখানা পাঁজরা চান দিতে রাজি আছি। বই চাইবেননা।'

আমি তবু হা হা করে হেসে বললাম, আরে, ওসব কথা অন্যদের জন্য। সুকান্তর সঙ্গে আমার সেরকম সম্পর্কই নয়। আমরা হস্টেলে এক ঘরে থাকতাম, এক বিছানায় শুয়েছি, এক ব্লেডে দাড়ি কামিয়েছি—

সেই মুহূর্তে জুতো মশমশিয়ে সুকান্ত এসে ঢুকল। আমাকে দেখে বলল, কী রে, আজকাল পাত্তাই পাইনা কেন তোর।

ঝর্না এমনিতে খুব ভদ্র। সুকান্ত ফেরামাত্রই বইয়ের কথা তুললনা। বরং মুখোজ্জ্বল করে বলল, আপনি তাহলে আর-একটু বসুন। এক্ষুনি যাবেন কী?

খানিকটা বাদে সুকান্ত যখন ঘন-ঘন আমার হাতের বইগুলোর দিকে

তাকাচ্ছে, আমি নিজে থেকেই বললাম, সুকান্ত, আমি এই কটা বই পড়তে নিচ্ছি, কবে ফেরত দেব ঠিক নেই। তাড়া দিসনি।

সুকান্তর মুখখানাও কালো হয়ে গেল। ঝর্নার দিকে একবার কটমট করে তাকাল। অর্থাৎ, তুমি বুঝি ওকে আলমারি খুলে দিয়েছ? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কঠিনভাবে বলল, দেখি, কী কী বই?

আমি সহাস্যে বইগুলো এগিয়ে দিলাম। পাঁচখানা বই, সুকান্ত প্রত্যেকটার পাতা উল্টে দেখল, মুখ তুলে আমার চোখে চোখ রাখল। আমিও তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। দুটি নেকড়ে বাঘ যেন পরস্পরের ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরি।

ঝর্না আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি তাহলে আর-একটু চা খান! ওর জন্য তো চা করবই—

—হ্যাঁ চা খাব। সঙ্গে যদি আরও কিছু থাকে, তাতেও আপত্তি নেই।

ঝর্না ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই আমি সুকান্তকে ফিসফিস করে বললাম, দ্যাখ চাঁদু, বেশি চালাকি করবি তো বউয়ের সামনে প্রেসটিজ পাংকচার করে দেব!

ঝর্না ঘরে ফেরা মাত্রই সুকান্ত অতিশয় উৎসাহ দেখিয়ে বলল, আরে, ওর কথা আলাদা। ও যখন যে-বই চাইবে দেবে। ও আমার কতকালের বন্ধু, ওর সঙ্গে আমি...

সুকান্তর আলমারি থেকে যে-পাঁচখানা বই বেছে নিয়েছি, তার প্রত্যেকটিই আমার। এর মধ্যে একখানা আবার ব্রিটিশ কাউন্সিলের বই, আমাকে টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। সুকান্ত বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বই নিয়ে চিরকাল মেরে দিয়েছে। বেশি পীড়াপীড়ি করলে সুকান্ত মুখ কাচুমাচু করে বলত, বইগুলো হারিয়ে গেছে!

এখন সুকান্ত বিয়ে করেছে। ওর বউ আলমারি কিনে সব বই সাজিয়ে রেখেছে। এখন এই আমাদের সুযোগ মাঝে-মাঝে ওর বাড়িতে এসে চা খাওয়া ও বইগুলো ফেরত নিয়ে যাওয়া।

৪

ছেলেবেলায় ইস্কুলে সবাইকেই প্রায় একটা রচনা লিখতে হয়। তোমাকে যদি এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তুমি কী করিবে? আমি লিখেছিলাম, আমি ঐ টাকা দিয়ে একটা ছোটখাটো জাহাজ কিনে কোন একটা দ্বীপ দেখতে যাব। খুব বকুনি খেয়েছিলাম মাস্টারমশাইয়ের কাছে। কেননা, ঐসব রচনায় লিখতে হয়, টাকা পেলে ইস্কুল বানাব কিংবা হাসপাতাল করব কিংবা গরিব দুঃখীকে দান

করব—এই ধরনের। একেই তো আমার বাংলা লেখা খুবই কাঁচা, তার ওপর ঐরকম স্বার্থপর চিন্তা—সেই রচনায় আমি কুড়ির মধ্যে ছয় পেয়েছিলাম মোটে। কুড়ির মধ্যে আঠারো পেয়েছিল শৈবাল, আমারই পাশে বসত সে। শৈবাল সবিস্তারে প্রচুর আবেগের সঙ্গে বর্ণনা দিয়েছিল, ঐ টাকায় সে তাদের দেশের গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরি করে দেবে, গ্রামবাসীর অনেক দুঃখ দূর হবে।

যাইহোক, আমি এখনো আমার মত বদলাইনি। কিংবা আমার মত বদলাবার সুযোগ দেবার জন্য কেউ আমাকে একলক্ষ টাকা দিয়েও দেখেনি। সুতরাং আমি কল্পনা করতে ভালোবাসি যে, ঐরকম কিছু টাকা পেয়ে গেলে আমি একটা জাহাজ কিনে ফেলবই—এবং সেই জাহাজে চড়ে নতুন-নতুন দ্বীপ দেখতে যাব। একলক্ষ টাকায় জাহাজ পাওয়া না-যাক, ছোটখাটো স্টিমার বা মোটরবোট হলেও আমার চলবে। এক-একজন মানুষের জীবনে এক-একটা বিশেষ শখ থাকে—আমার শখ, কোন জনমানবহীন দ্বীপে বেড়াতে যাওয়া। কোনদিন এই শখটা মিটবেনা বলেই কল্পনা করতে বেশি ভালো লাগে। এইজন্যই, 'পদ্মানদীর মাঝি'র হোসেন মিঞা আমার প্রিয় চরিত্র।

গতসপ্তাহে আমার স্কুলের বন্ধু পরিতোষের সঙ্গে বহুদিন পর দেখা। সে বলল, খবর শুনেছিস?

—কী খবর?

—তুই শুনিসনি এখনো? সব্বাই জানে—শৈবাল লটারির টাকা পেয়েছে।

—কোন শৈবাল?

—সেই যে ইস্কুলে আমাদের সঙ্গে পড়ত, আমরা বলতাম মোটা শৈবাল—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই নাকি? কোন লটারি, কত টাকা?

শৈবাল স্কুলে পড়াশুনোয় বেশ ভালো ছেলে ছিল। বাংলায় ফার্স্ট হতো প্রত্যেকবার। কিন্তু সেজন্য সে এখন বাংলার অধ্যাপক কিংবা সাহিত্যিক হয়নি, কী একটা ওষুধের কম্পানিতে কেমিস্টের চাকরি করে। স্কুলে ওর পাশাপাশি বসতাম আমি, অথচ বহুকাল ওর সঙ্গে দেখা হয়না।

পরিতোষের সঙ্গে শৈবালের এখনো যোগাযোগ আছে। পরিতোষ বলল, চল, শৈবালকে কংগ্রাচুলেশান জানিয়ে আসি! লটারিতে প্রাইজ পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা, ক্ষণজন্মা লোক না-হলে পায়না!

খবরের কাগজে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই লটারির ফলাফলের বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। অর্থাৎ প্রত্যেক সপ্তাহেই এদেশে একজন নতুন লাখপতি জন্মাচ্ছে। ভারি চমৎকার লাগে ভাবতে। এইরকমভাবে ভারতের পঞ্চান্ন কোটি লোকই যদি কোন

একদিন লাখপতি হয়ে যায় তাহলে এক অপূর্ব সোসালিজমের জন্ম হবে। আমি লটারির টিকিট কাটিনা—কারণ একথা ঠিক জানি, পঞ্চান্ন কোটি লোকের আর সব্বাই যদি লাখপতি হয়ে যায়—তাহলে আমি তো আর একা বাকি থাকতে পারিনা —তাতে দেশের বদনাম হবে। তখন গভর্নমেণ্ট থেকে এমনি-এমনিই একলাখ টাকা দিয়ে দেবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমি এ-পর্যন্ত কোন লটারির টাকা-পাওয়া লোককে স্বচক্ষে দেখিনি। ফার্স্ট প্রাইজ তো দূরের কথা, একশো টাকার প্রাইজও চেনাশুনো কেউ পেয়েছে বলে শুনিনি। অচেনা লোকরাই ওসব পায়। কিন্তু শৈবাল, আমাদেরই স্কুলে পড়ত যে মোটা শৈবাল, সে প্রাইজ পেয়েছে, তাকে একবার চোখে দেখার লোভ সামলাতে পারলামনা। গেলাম পরিতোষের সঙ্গে।

গিয়ে শুনলাম শৈবাল তখনো অফিস থেকে ফেরেনি। শৈবালের স্ত্রী অলকা চেনে পরিতোষকে। সে আমাদের বসতে বলল। শৈবালের বোন অঞ্জনা, যাকে ছেলেবেলায় চিনতাম, চা দিয়ে গেল। চায়ের সঙ্গে দুটি ক্রিম ক্র্যাকার।

আমি আশা করেছিলাম, এসে দেখব, সারা বাড়িতে একটা বিরাট হৈ-চৈ চলছে, প্রচুর আত্মীয়-স্বজন এসেছে, দারুণ খাওয়াদাওয়া। লাখ টাকা প্রাইজ পেয়েও শৈবাল অফিস যাবে—এটাও আশা করা যায়না। অলকা আর অঞ্জনার মুখে কোন চাপা উল্লাসের চিহ্নও নেই; অঞ্জনা আমাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে ভিতরে চলে গেল। পরিতোষ ফিসফিস করে আমাকে জানাল, অঞ্জনা একটা বখাটে ছেলেকে বিয়ে করতে চায় বলে—ওকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেওয়া হয়না।

একটু বাদেই শৈবাল এল, বেশ-কিছুটা অবাক, খানিকটা খুশিও হল। জিজ্ঞেস করল, চা খেয়েছিস? আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে শুনে ও আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলনা—শুধু নিজের জন্য চা দিতে বলল। অনুযোগ করে জানাল অফিসে বড্ড কাজের চাপ, রোজ ওভারটাইম করতে হয়—সাড়ে-ছটার আগে বেরুতে পারেনা।

শৈবাল গেল অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে আসতে। পরিতোষ আবার ফিসফিস করে বলল, এতগুলো টাকা পেয়েও শৈবালটা কীরকম কিপ্যুস আছে দেখলি? এতদিন বাদে এলাম, দিল কিনা শুকনো চা-বিস্কুট।

—বাঃ, টাকা পেয়েছে বলেই কি দুহাতে ওড়াবে নাকি?

—ওড়ানোর কথা হচ্ছেনা। চায়ের সঙ্গে দুটো সিঙ্গাড়া আর সন্দেশ দিতে পারতনা?

—চুপ, শৈবাল আর অলকা আসছে।

কথায়-কথায় লটারির টাকা পাওয়ার কথা উঠলই। শৈবাল পেয়েছে হরিয়ানার

সেকেন্ড প্রাইজ একলক্ষ টাকা। অলকা রীতিমতন আপশোশ করতে লাগল, ফার্স্ট প্রাইজ না-পাওয়ার জন্য। ফার্স্ট প্রাইজ ছিল পাঁচলক্ষ টাকা। একবার লাক কেটে গেলে আর কি পাওয়া যায়! অলকা নাকি আগেই ভেবেছিল সি গ্রুপের টিকিট এবার ফার্স্ট প্রাইজ পাবে—ওর মন বলছিল। সি গ্রুপেরই টিকিট কিনেছে—সি গ্রুপ থেকেই এবার ফার্স্ট আর সেকেন্ড প্রাইজ উঠেছে—কিন্তু ওদেরটাই হয়ে গেল সেকেন্ড।

প্রাইজ পাবার পুরো কৃতিত্বটাই অলকা নিতে চায়। শৈবাল বিশেষ আপত্তি জানালনা তাতে, মুচকি হাসতে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, টাকাটা দিয়ে কী করবি, কিছু ঠিক করেছিস?

—অনেকে পরামর্শ দিচ্ছে, ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটে রাখতে। কিন্তু আমি ভাবছি...আচ্ছা, এ-বাড়িটার কত দাম হবে বলতে পারিস?

—এই বাড়িটা? না, ঠিক আইডিয়া নেই।

—তবু মোটামুটি একটা আন্দাজ কর—নিচে একটা ফ্ল্যাট আছে। আর আমাদের এটা। আমরা ভাড়া দিই সাড়ে তিনশো করে—প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা বেরিয়ে যায়। তাই ভাবছিলাম এই বাড়িটাই যদি কিনে ফেলা যায়—কিন্তু বাড়িওয়ালা আশি হাজার টাকা দর হাঁকছে।

অলকা বলল, আমি বলছি এ-বাড়ি কিনতে হবেনা। তার চেয়ে বরং লবণহ্রদে পাঁচ কাঠা জমি কিনে—

শৈবাল বলল, জমি কিনে নতুন বাড়ি তৈরি করা কম হাঙ্গামা নাকি? আমি অফিস থেকে ছুটি পাবনা—নিজে দেখাশুনো করতে না-পারলে সবাই ঠকাবে। তার চেয়ে এ-বাড়িটাই ভালো, পজিশনটাও বেশ ভালো আছে। কিন্তু আশি হাজার টাকা, টু মাচ। তুই কী বলিস?

আমি কাঁচুমাচুভাবে উত্তর দিলাম, ভাই, বাড়ির দাম সম্বন্ধে আমার কোন আইডিয়া নেই।

—আশি হাজার যদি কিনতেই লাগে, তারপর কিছু রিপেয়ার করতেই হবে, তাতে অন্তত পাঁচ হাজার—বোনটার বিয়ের জন্য আর দেরি করা ঠিক নয়—তাতেও কম করে...

এরপর কিছুক্ষণ আলোচনা চলল, তাতে বেশ বোঝা গেল, একলাখ টাকায় শৈবালদের বাজেট কিছুতেই কুলোচ্ছেনা। কোনক্রমে টেনেটুনে যদি একলাখ টাকায় বাজেট করতেও পারে, তাহলে পরবর্তী দিনগুলো ওদের বেশ কষ্টে-সৃষ্টে টানাটানি করে চালাতে হবে। হাতে কিছু থাকবেনা। অলকা এরই মধ্যে পাঞ্জাব

ও দিল্লির লটারির দুখানা টিকিট কিনে ফেলেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, শৈবাল, হুগলিতে তোদের সেই দেশের বাড়িটা কী হল?

—সেখানে আর যাইনা। রাস্তাঘাট এত খারাপ যে যাওয়াই এক ঝঞ্ঝাট। সারা বছরই বলতে গেলে থকথকে কাদা—কে যাবে সেখানে। আমার এক কাকা থাকেন—

ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি পরিতোষকে বললাম, ইস্কুলের রচনায় শৈবাল লিখেছিল যে, একলক্ষ টাকা পেলে ও নিজের গ্রামের রাস্তা বানিয়ে দেবে। সে-কথা ওর এখন একবারও মনে পড়লনা কিন্তু!

পরিতোষ বলল, কী করে রাস্তা বানাবে এখন? দেখছিস না, ওর নিজের বাজেটই এতে কুলোচ্ছেনা। আমার তো মনে হচ্ছে, একলাখ টাকা পাওয়ার ফলে বেচারীকে না না-খেয়ে থাকতে হয় শেষে!

তারপর পরিতোষ আবার বলল, যে জিনিশটা আমরা এখনো পাইনি সে-সম্পর্কে অনেককিছু কল্পনা করা যায়। যেমন ধর, পণ্ডিত নেহরু একসময় বলেছিলেন, ক্ষমতা পেলে তিনি সব ব্ল্যাক মারকেটিয়ারদের ধরে-ধরে ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসিতে ঝোলাবেন। কিন্তু ক্ষমতা পাবার পর দেখলেন, ল্যাম্পপোস্টগুলো ঠিক মজবুত নয়, কিংবা ফাঁসির দড়ি ঠিক মতন পাওয়া যাচ্ছেনা—অর্থাৎ এ-ও সেই বাজেটে না-কুলোনোর ব্যাপার!

আমি মনে-মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস আমি এখনো একলক্ষ টাকা পাইনি। তাই দ্বীপ দেখার স্বপ্নটা আমার এখনো সম্ভ্রান আছে।

৫

দুপুরবেলা অনিমেষের অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলাম। খানিকটা পরে মনে হল, না-এলেই ভালো হতো।

অনিমেষ একটা ছোটো অফিসে চাকরি করে। এক মারোয়াড়ি কম্পানির আমদানী-রপ্তানীর শাখা অফিস। স্ট্র্যান্ড রোডে তিন-চারখানা ঘর নিয়ে অফিস, দশ-বারোজন কর্মচারী, একজন মারোয়াড়ি বড়োবাবু, অনিমেষের কাজ ইংরেজিতে চিঠিপত্র লেখা। ধুতি ও হাফশার্ট, শীত, গ্রীষ্ম বারোমাস অনিমেষের পায় কেড্‌স জুতো—কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ, শান্ত লাজুক প্রকৃতির। ভেবেছিলাম

অনিমেষের অফিসটা নিরিবিলি হবে—এই শীতের মনোরম দুপুরে কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। আমি দুপুরবেলা একাকীত্ব একেবারে সইতে পারিনা। আর অনিমেষও, ভিড়ের মধ্যে বা অনেক বন্ধুর মধ্যে একেবারেই কথা বলতে পারেনা—কিন্তু একা-একা দেখা হলে অনেক কথা বলে।

ও আমাকে দেখে উদ্ভাসিত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আয় একটু বোস —আমি ততক্ষণে হাতের কাজটা সেরে নিই। তারপর—। চা খাবি তো?

চা আনতে পাঠিয়ে অনিমেষ কী একটা চিঠি শেষ করতে লাগল। মাস দু-এক ওকে দেখিনি, আজ লক্ষ করলাম, ওর মুখ চোখ যেন কিছুটা শুকিয়ে গেছে। ক্রমশই শুকিয়ে যাচ্ছে—গত সাত-আটবছর ধরে দেখছি। আমারই সমান বয়েস —তবু ওর মুখের চেহারা আমার চেয়ে অনেক রুক্ষ, রেখাময়—সারা মুখের মধ্যে নাকটাই এখন বেশি প্রকট।

অনিমেষ নিজের জীবনে একজন খাঁটি ব্যর্থ মানুষ। আমি আমার নিজের ব্যর্থতার কথা জানিনা, ক্বচিৎ দৈবাৎ যদি নিজের দিকে তাকিয়ে আমি বুকের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের ঘাট দেখতে পাই—সেই ভয়ে আমি একা থাকতে পারিনা —ছুটে-ছুটে যাই অন্য মানুষের দিকে—আমি তাদের ব্যর্থতা দেখার চেষ্টা করি। আমি অনিমেষের অনেকগুলি ব্যর্থতার কথা জানি।

ছেলেবেলায় অনিমেষ ছিল আমাদের মধ্যে পড়াশুনোয় সবচেয়ে ধারালো ছেলে, ইংরেজি পরীক্ষায় প্রতিবার ফার্স্ট হতো। আমরা ভাবতাম, অনিমেষ একসময়ে নামকরা ইংরেজির অধ্যাপক হবে। কিন্তু, কী কারণে যেন বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজি অনার্সে ফেল করে গেল অনিমেষ, আর ওর পড়াশুনো করাই হলনা। মানিকতলার দিকে বেশ চমৎকার তিনতলা বাড়ি ছিল ওদের, ওর বাবা মারা যাবার কয়েকদিন পরই জানাতে পারলাম, সে-বাড়ি নাকি অনেকদিন আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। অনিমেষরা এখন আছে বরানগরের এক নড়বড়ে ভাঙা বাড়িতে। সংসারে ছোটো ভাই-বোন, মা-ও বিধবা পিসি—সকলেই পাখির ছানার মতো হা করে আছে, অনিমেষ সারামাস খেটে ওদের মুখে খাবার এনে দেবে। অনিমেষ রত্না নামে একটা মেয়েকে ভালোবাসত কলেজজীবনে। তখন আমরা ভাবতাম, এ অত্যন্ত বিসদৃশ জোড়—অনিমেষের মতো বুদ্ধিমান ছেলের পাশে ওরকম একটা বোকা অহংকারী মেয়েকে মানায়না। রত্নার ধারণা ছিল সে সুন্দরী, কিন্তু আসলে একটা পুষি বেড়ালের মতো চেহারা। দেখা হলেই গড়গড় করে যত কথা বলত —তার একটি কথাও না-শুনলে—পৃথিবীর কিছুই যায়-আসেনা। অথচ অনিমেষ ছিল রত্নারই জন্য গোপন উন্মাদ। কোনদিন রত্নাকে কিছু বলতে ভরসা পায়নি, যেদিন মুখ ফুটে বলল, সেইদিনই প্রত্যাখ্যান—তখনও অনিমেষ বাবা ও তিনতলা

বাড়ি হারায়নি। রত্না ওরই সমান আর-একটি বোকা—পরাশরকে বিয়ে করেছে। এবং ওরাই জীবনে সাকসেসফুল। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে চাকরি নিয়ে রত্না আর পরাশর এখন আছে সুইটসারল্যাণ্ডে! অনিমেষ আর কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি।

কিন্তু এ সবই তো বাইরের ব্যর্থতা। অনিমেষ তার চেয়েও বেশি হেরে গেছে। অনিমেষের চেহারায় কোন খুঁত ছিলনা—দীর্ঘ চেহারায় সুপুরুষই বলা যায়, কিন্তু ক্রমশ ও ভিড়ের যে-কোন লোক হয়ে গেল। কোনদিন ও রুখে দাঁড়ালনা। পৃথিবীতে ও একটি দাবিও আদায় করে নিতে চেষ্টা করলনা। কোন গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে পথ দিয়ে যাবার সময় আমি যদি দূরে অনিমেষকে দেখি, আমিও হয়তো ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করব। ভিড়ের মধ্যে মিশে থেকেই হয়তো অনিমেষ একদিন অগোচরে অদৃশ্য হয়ে যেতে চায়।

অনিমেষ বলল, আর-একটু বোস, হয়ে গেছে, আমি চিঠিটা টাইপে দিয়ে আসি! ওর জামার হাতা ঢল-ঢল করছে, মনে পড়ল, একসময় সৌখিন অনিমেষ সোনার বোতাম ব্যবহার করত।... ওর অফিসঘরটা ছোটো, আরও দুটো চেয়ার আছে—একটি চেয়ারে কোট রাখা, অন্যটি খালি। যাক, কিছুক্ষণ নিরিবিলিতে গল্প করা যাবে।

ফিরে এসে ও বলল, টাইপিস্ট আসেনি আজ। চিঠিটা জরুরি ছিল—তা আর কী করব!

জিজ্ঞেস করলাম, তোর বাড়ির সব কেমন আছে।

ও স্মিত হেসে বলল, ভালোই।

বুঝতে পারলাম, এই যে ভালো কথাটির সঙ্গে একটা 'ই' যোগ করে দেওয়া এবং স্মিত হাসি—এর পিছনে অন্তত আছে মায়ের বাতের ব্যথা, ছোটো বোনটার জ্বর, পিসিমার চোখ অপারেশন করাতে হবে—ইত্যাদি। এগুলিরই সংক্ষিপ্ত রূপ, ভালোই! আমি জানি অনিমেষ যখন মরে যাবে তখন মরার ঠিক আগের মুহূর্তে যদি ওকে জিজ্ঞেস করা হয়, কেমন আছিস, ওর যদি উত্তর দেবার ক্ষমতা থাকে তখন, তবে অনিমেষ নিশ্চিত তখনও বলবে স্মিত হাসি হেসে, এই একটু মরে যাচ্ছি আর কী!

—আবেশ, উত্তেজনা অনিমেষের জীবন থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

সুতরাং কী কথা শুরু করব? আমি তাই আলগাভাবে বললাম, তোদের অফিস থেকে গঙ্গা দেখা যায় দেখছি!

—হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে জাহাজের বাঁশিও শোনা যায়। এ-বাড়ির ছাদে উঠলে

দেখা যায় অনেকদূর পর্যন্ত। শীতকালের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখতে ভালো লাগে।

—চল-না, ছাদেই যাই। নাকি, অসুবিধে হবে তোর অফিসে?

—নাঃ অসুবিধে কী! চল—

এইসময়ে ঘরে একটি লোক ঢুকল। বলে দিতে হয়না, এই লোকটিই এ-অফিসের মারোয়াড়ি বড়োবাবু। সার্জের সুট, হাতে সোনার ব্যান্ডের ঘড়ি। কিন্তু বিশাল ভুঁড়ি ও মুখে পানের দাগ—দর্পিত পদশব্দ—বড়োবাবুর এই চিহ্নগুলিও আছে। লোকটির বাংলা জ্ঞান নিখুঁত। আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অনিমেষকে জিজ্ঞেস করল, চ্যাটরজি নন ফেরাস মেটালের সেই চিঠিটা হয়েছে?

অনিমেষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ।

—এখুনি পাঠিয়ে দাও!

—সেটা তো গতকালই পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি সই করে দিলেন—

—আমাকে এজেন্টরা ফোন করেছিল—আমি বলতে পারলামনা, আমার প্যাডে লিখে দিয়ে আসবে তো!

—আপনিই সই করলেন কিনা—

—আমার মাথায় বৃহৎ কাম ঘোরে। একটা চিঠঠির কথা মাথায় ভরে রাখলে চলেনা। প্যাড আছে কী জন্যে? ডেপুটি কন্ট্রোলারের চিঠিটাও হয়ে গেছে কাল?

—না, ওটা আজ লিখেছি। কিন্তু টাইপিস্ট আসেনি।

এবার কি কারবারটা ডকে তুলব? কেন আসেনি কেন?

—আপনার কাছ থেকেই ছুটি নিয়েছে শুনলাম—

—টাইপিস্ট ছুটি নিয়েছে বলে চিঠি যাবেনা? ডেপুটি কন্ট্রোলার সে-কথা বুঝবে?

—হাতে লিখে পাঠাব?

—আমাদের কারবারের কি প্রেস্টিজ নেই যে হাতে লিখে চিঠি যাবে? চিঠঠিটা আজই যাওয়া দরকার।

—আমি তো টাইপ জানিনা।

—টাইপ আবার জানা আর না-জানা কী! একটু সময় বেশি লাগবে। বাজে গপ্পোসপ্প না-করে চিঠিটা টাইপ করে ফেলুন। যদি দেরি হয়ে যায়, ওভারটাইম নিয়ে লেবেন! যান!

লোকটা আবার পায়ের শব্দ করে চলে গেল। লোকটার অসম্ভব রূঢ়তায় এবং অভদ্রতায় আমি খুবই রেগে উঠেছিলাম—কিন্তু দুনিয়ার এত মানুষের বিরুদ্ধে রেগে ওঠার আছে যে বন্ধুর অফিসের বড়োবাবুর বিরুদ্ধে আর রাগ দেখিয়ে লাভ

কী—এই ভেবে চুপ করে বসেছিলাম। ঐরকম বাক্যালাপের পরই আমি চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি—অনিমেষ এসব সহ্য করেও এখানে হাসিমুখে চাকরি করবে—কিন্তু আমার এসব সহ্য করার দরকারটা কী! কিন্তু অনিমেষ আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, আর-একটু বোস।

নিজেই পাশের ঘর থেকে টাইপরাইটারটা নিয়ে এল ঘাড়ে করে। সেটাতে কাগজ পরিয়ে টকাটক শুরু করল। আমি এই দুপুরবেলা টকাটক শোনার জন্য আসিনি। একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, তুই কাজ কর, আমি চলি রে!

—বোস, আর-এককাপ চা খেয়ে যা।

আমার সত্যিই অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। অনিমেষদের অফিসে হয়তো এটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আমার সামনেই অপমানিত হয়ে অনিমেষ নিশ্চয়ই বেশি লজ্জিত হয়েছে। এখানে আমার না-আসাই উচিত ছিল। অনিমেষের মুখ কিন্তু আগের মতোই প্রশান্ত, নির্বিকার। থাকতে না-পেরে বললাম, তুই জীবনে আর কত সহ্য করবি? মানুষের কাছে এত ছোটো হতে-হতে তোর আর মনুষ্যত্ব কী থাকবে?

—কার কাছে ছোটো হলাম? ঐ রাজোরিয়ার কাছে? ওর কাছে আর অপমান হবার কী আছে? ও তো আর বেঁচেই নেই!

—কী বলছিস...

অনিমেষ টাইপরাইটার থেকে মুখ তুলে সেইরকম স্মিত হেসে বলল, সত্যি ও-লোকটা আমার সামনে আর বেঁচে নেই। অনেকদিন আগেই আমি ওর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। তারপর আমিই ফাঁসি দিয়েছি ওর। ওর চরম নির্বুদ্ধিতা এবং বুনো শুয়োরের মতো গোঁয়ার্তুমি দেখে আমি ঠিক করেছিলাম, ওর আর বাঁচার অধিকার নেই। অনেকদিন আগে, ও যখন আরও বাচালের মতো কথা বলছিল—আমি এই চেয়ারেই বসে থেকে বিচারকের আসনে বসেছিলাম, ওর ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলাম শান্তভাবে। তারপর, নিজেই উঠে এসে—আমিই তখন জল্লাদ সেজে ওর গলায় দড়ি পরিয়ে ওকে ঝুলিয়ে দিয়েছি। ও তখনও কথা বলে যাচ্ছিল—কিন্তু জানলনা, সেই মুহূর্তে ওর ফাঁসি হয়ে গেল। তারপর থেকে ওর কোন কথাই আমার গায় লাগেনা। ও তো একটা মড়া—ওর আবার কথার মূল্য কী।

আমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে ও আবার বলল, তোর অবাক লাগছে? শাস্ত্রে আছে, অতি মূর্খ এবং স্মৃতিভ্রষ্ট মৃতের সমান। দেখছিস-না—আমি ওকে মেরে ফেলেছি বলে যে-চিঠি ও নিজে সই করেছে—তার কথাও ওর মনে থাকেনা! টাইপিস্টকে ছুটি দিয়ে নিজেই ভুলে গেছে—একি জীবিত মানুষের

লক্ষণ? ওর কথায় আবার রাগ করব কী?

—কিন্তু, তুই ওর কথা অমান্য করতেও পারিসনা।

—কারণ, ওর কাছ থেকে আমি অর্থ পাই। অর্থ মৃতের হাত দিয়ে আসুক আর জীবিতের হাত দিয়ে আসুক—তার মূল্য একই। তার সঙ্গে মানসম্মানের প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন সেখানে—যদি আমি ওকে ভয় করতাম। কিন্তু আমি ওকে ভয় করিনা —কারণ, আমি ওকে চরম শাস্তি দিয়েছি!

—তুই এইভাবে সব মানুষকে দেখিস!

—হ্যাঁ। সেদিন ট্রামে একটা পুলিশ ভারী জুতো দিঁয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিল। আমি ভেবেছিলাম, সে দুঃখিত বা লজ্জিত হবে। পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছিলাম। কিছুই হলনা—ভ্রূক্ষেপও করল না। তখন আমি ওর একটা পা কেটে ফেলার হুকুম দিলাম। তারপর নিজের করাত দিয়ে পুচিয়ে-পুচিয়ে সেই ট্রামের মধ্যেই ওর একটা পা কেটে বাদ দিলাম। ও জানেনা। এখনও ওকে দেখি মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে সদর্পে, কিন্তু ও জানেনা—আমার কাছে ওর একটা পা চিরকালের মতো খোঁড়া—কোনদিন আর আমাকে আঘাত করতে পারবেনা। কলেজে পড়ার সময় রত্না আমাকে অন্যায়ভাবে অপমান করেছিল। আমি ওকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছি। কী কঠিন সেই দণ্ড।...এই তো সেদিন, আমার বাড়িওয়ালা বিষম পাজী ছিল—কোন কথায় কান দিতনা। আমি তার কানদুটো কেটে নিয়েছি। লোকটা জানেনা—এখনও মনের সুখে কাগজ পাকিয়ে কান চুলকোয়, কিন্তু জানেনা, আমি ওর কানদুটোই কেটে নিয়েছি—সেখানে দুটো রক্তাক্ত গর্ত আমি স্পষ্ট দেখতে পাই।....

আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, অনিমেষের এসব পাগলামির লক্ষণ কিনা। টাইপ মেসিনের ওপাশে—ময়লা হাফশার্ট গায় অনিমেষ একবার জোব্বা-পরচুল পবে কঠিন বিচারক হয়ে যাচ্ছে—আবার সে পবমুহূর্তে কালো কাপড় পরে খড়গ হাতে নিয়ে হয়ে যাচ্ছে নৃশংস জল্লাদ। কে জানে এসব পাগলামি কিনা—কিন্তু এই খেলা নিযে অনিমেষ সুখেই আছে মনে হল।

৬

আগে মস্তানি, পিছে পস্তানি!

কথাটা নতুন শুনলাম, ভালোই লাগল। যে-লোকটি বলল কথাটা, তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। খালি গা, কালো তেলচকচকে দেহ, ধুতির এক পাক কোমরে

জড়িয়ে মোটা করে গিঁট বাঁধা। লোকটার হাতে একটা ছোটো লাঠি, রাগে দুলছে। কথাটা ও শত্রুর উদ্দেশ্যে বলছে বোঝা যায়, নিজেকে সাবধান করছেনা। শত্রু অবশ্য তখন অনুপস্থিত।

আর-একটা নতুন কথাও সেখানে শুনলাম। 'লাল বল'। অনেকক্ষণ কথাটাব মানে বুঝতে পারিনি। দশ-বারোজন নারী-পুরুষের জটলা, উত্তেজিত চিৎকার, শাসানি, তার মাঝে-মাঝেই শোনা যাচ্ছে, 'লাল বলটা এই তো এখানে ছিল', 'আমি নিজের চোখে দেখেছি লাল বলটা নিয়ে ভেগে গেল' ইত্যাদি। এতগুলো বয়স্ক লোক সত্যি-সত্যিই একটা লাল বল নিয়ে বিচলিত—এটা বিশ্বাস করা যায়না। বাচ্চা ছেলের খেলার জিনিশ, চুরির ঝগড়া এ নয়।

আমি ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলাম, লাল বলটা কী? ইন্দ্রনাথও ঐ একই ব্যাপারে চিন্তা করছিল বোধহয়, হেসে বলল, কী জানি! বুঝতে পারছিনা।

মাটির দাওয়ায় চাটাইয়ের ওপর হেলান দিয়ে বসেছিলাম দুজনে। মালদা শহর থেকে আট-দশমাইল দূরে, জায়গাটার নাম পাণ্ডুয়া। সেই পাণ্ডুয়া—যেখানে রাজা গণেশের রাজধানী ছিল, বাজা গণেশের ছেলে ইসলামে ধর্মান্তরিত হযে শেখ জালালুদ্দীন নাম নিয়েছিল—তার সমাধিভবন আর রাজ দরবারের ধ্বংসস্তূপ দেখতে গিয়েছিলাম। ঠা ঠা করছে রোদ, প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, পিচের রাস্তা এমন চটচটে যে জুতো আটকে যায—কোনরকমে চক্কর মেরে আমরা ফিরে এলাম বড়ো রাস্তায়, এখান থেকে ফের বালুরঘাট যাবার বাস বা ট্যাক্সি ধরতে হবে। কখন তা পাওয়া যাবে ঠিক নেই।

মোড়ের মাথায় একটা ছোটো চায়ের দোকান, সেখানে দুকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বাসের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম, চা তৈরি কবছিল একজন স্ত্রীলোক, সে বলল, আহা ভাইয়েরা আপনারা রোদ্দুরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমাব ঘরের দাওয়ায় এসে বসুন।

মাটির ঘর, তাই মেঝেটা একটু ঠাণ্ডা, সেখানে আধ-শোয়া হয়ে আমরা দুজনে ঘাম মুছতে-মুছতে ঝগড়া শুনতে লাগলাম। এখানে সেই লাল বল নিয়ে আন্দোলন চলছে। যাক, আমাদের পক্ষে ভালোই তো, সময় কেটে যাবে।

অবিলম্বে লাল বলের অর্থ আমরা নিজেরাই বুঝতে পারলাম। বলদকে এখানে বল বলে। কিন্তু লাল রং? লাল গরুর কথা শুনিনি। মেটে-মেটে রঙের গরু হয় বটে—। অর্থাৎ মামলাটা গরু চুরির।

ভিতর দিকে মুসলমানদের প্রাচীন বসতি—অদূরে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের কলোনি, তার উল্টোদিকে সাঁওতালদের গ্রাম। সুতরাং এলাকাটা যে তপ্ত বিছানা হয়ে থাকবে—তা তো খুবই স্বাভাবিক। আজকের ঝগড়াটা সাঁওতাল

আর উদ্বাস্তুদের মধ্যে। মারামারির নিশ্চয়ই অনেক কারণ থাকে—দুপক্ষেরই গরু চুরিটা নেহাত ছুতো।

উদ্বাস্তুরা এখানে বিদেশি, কিন্তু পনেরো-কুড়ি বছর কেটে গেছে, অনেকটা শিকড় গেড়েছে, এখন আর সেই আগেকার মতন ভীতু দয়াপ্রার্থী ভাব নেই। এখন তারাও এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়ায়, পুরো অধিকার দাবি করে। সুতরাং তিনপক্ষই এখন সমান-সমান—মুসলমান, উদ্বাস্তু, সাঁওতাল—এদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-লড়াই বাধে, দুপক্ষ যখন লড়াই করে—বাকি একপক্ষ তখন চুপ করে থেকে মজা দেখে।

বেশ বুঝতে পারলাম, আজ সাঁওতাল বনাম উদ্বাস্তু একটা ঘোরতর লড়াই বাঁধতে আর দেরি নেই। উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা ছেলে, নাম তার লখা, সে শুধু চোর নয়, পুরোপুরি মস্তান। বাবলা গাছে বাঁধা ছিল সাঁওতালদের একটা গরু, সে সেটা শুধু খুলে নিয়ে যায়নি, যাবার সময় চেঁচিয়ে বলে গেছে—সাঁওতালরা আবার গরু পুষবে কী? ওরা কুকুর পুষুক! গরু আমাদের কাজে লাগবে!—কেউ একজন তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, লখা ও-গরুতে হাত দিসনি, ওটা দুখো মাঝির গরু, দুখো মাঝি তুলকালাম করবেনি! লখা নাকি তার উত্তরেও বলেছিল, যা যা! ওরকম দু-দশটা দুখো মাঝিকে হাপুর হাটে কিনে বেচতে পারি! বলিস তাকে বলদ ছাড়িয়ে আনতে—দেখব তার কত হেম্মৎ!

লখার চরিত্রটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। এ-নাটকে ভিলেন হিসেবে সে খুব জোরালো। কিন্তু মঞ্চে তাকে দেখা যাচ্ছেনা। দুখো মাঝিকে দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—এই ভরদুপুরেই কিছুটা নেশা করেছে মনে হয়।—চোখে রাগ কিন্তু ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি—এইসব লোক সত্যিই বিপজ্জনক।

খানিকটা শরীর ঠাণ্ডা হয়েছে, হেলান দিয়ে বসে আমরা দুই বন্ধুতে উদগ্রীব হয়ে দেখছি। কখন মারামারি লাগবে! লাগলেই তো পারে—আমরা তাহলে দেখে যেতে পারতাম। আমরা দুজনেই মনে-মনে চাইছি—মারামারিটা তাড়াতাড়ি লাগুক! প্রায়ই মারামারি হয়, ভবিষ্যতেও হবে—এব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছুই নেই—সুতরাং এই উত্তেজক দৃশ্যটা দেখার সুযোগ নষ্ট করার কোন মানে হয়না। সাইকেল আছে, ট্রানজিস্টার আছে, অনেকের হাতেই ঘড়ি, তবু আদিম সমাজ। জমি আর জাতিভেদ নিয়ে লড়াই অনবরত চলবে। সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি যা-সব আমরা বলি—সে সবই শহুরে ফ্যাশান।

দুখো মাঝি পিছন ফিরে দুর্বোধ্য ভাষায় কী একটা চিৎকার করে উঠল। দূর

থেকে তার উত্তর ভেসে এল। সেদিকে আমরা তাকিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, এবার জমবে মনে হচ্ছে। জন পনেরো সাঁওতাল দ্রুত পায় এগিয়ে এল, কারুর হাতে ধনুক, কারুর কাঁধে টাঙ্গি—সঙ্গে কয়েকটা শিকারী কুকুর। না, সিনেমার দৃশ্যের মতন ঠিক নয়, এ সাঁওতালদের খুবই দৈন্য দৃশ্য—অধিকাংশরই চেহারা ডিগডিগে, অস্ত্রগুলো প্রথমশ্রেণীর নয়—বহুদিন শান পড়েনি। তা হোক—রিফিউজিদেরই বা স্বাস্থ্য আর অস্ত্র কত ভালো হবে? এ-অঞ্চলে হাত বোমার কুটিরশিল্প চালু হয়েছে কিনা ঠিক জানিনা। দুপক্ষ প্রায় সমান-সমানই হবে মনে হয়।

আর-একটাও নতুন শব্দ শিখলাম। 'খিটকেল।' 'একি খিটকেল দেখুন দিনি দাদারা!' আমাদেরই বলছে। চায়ের দোকানের সেই স্ত্রীলোকটি। তিরিশের কাছাকাছি বয়েস, আঁটো স্বাস্থ্য, চোখদুটো বেশি উজ্জ্বল—স্ত্রীলোকটিকে দেখলেই বোঝা যায়--শুধু নিজের স্বামীকেই নয়—আশপাশের সকলকে হুকুম করার ক্ষমতা ওর আছে। একটু আগে চায়ের দোকানে ঐরকমই তার প্রতাপ দেখেছিলাম। কিন্তু এখন সে ভয় পেয়েছে। বারান্দার বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে আমাদের বলল, আমি কারুর সাতে নেই, পাঁচে নেই—আমারই দোকানের সামনে একি খিটকেল শুরু হল।

শুধু মারামারিতেই তো নাটক হয়না—মনস্তত্ত্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নারী চরিত্র—এসবও তো থাকবে। এবার সেদিকটা চোখে পড়ল। স্ত্রীলোকটি খুব সংক্ষিপ্তভাবে নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলল। ওদের পরিবারটিও উদ্বাস্তু। কিন্তু স্ত্রীলোকটি নিজের বুদ্ধিতে এই উন্নতি করেছে। কলোনিতে থেকে চাষবাস করার বদলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এই চায়ের দোকান বানিয়েছে। পাণ্ডুয়াতে প্রায়ই ভ্রমণকারী আসে—সুতরাং এখানে চায়ের দোকানের উপযোগিতা সে নিজের বুদ্ধিতেই বুঝেছিল। আশেপাশে কোন চায়ের দোকান নেই—বেশ চালু হয়েছে তার দোকান, পাশে এই মাটির বাড়িটা বানিয়েছে, পিছনে ধান জমি কিনেছে তিন বিঘে। তার দোকানে সাঁওতাল, উদ্বাস্তু, মুসলমান—সবাই চা খেতে আসে। সে নিজের হাতে চা বানায়—সবাই তাকে সুরোদিদি বলে ডাকে।

আজ লাল বলদটা চুরি হয়েছে প্রায় দোকানের সামনে থেকে। সাঁওতালরা এসে তাকে জিজ্ঞেসবাদ করছে। সে এখন কী বলবে? একজনের দোষে সবার দোষ। ঐ হারামজাদা লখাটা চোর-গুণ্ডা, কিন্তু দোষ পড়বে সব রিফিউজিদের নামে। লখাকে মারতে গেলে অন্য রিফিউজিরা দল বেঁধে রুখে দাঁড়াবে। অর্থাৎ দাঙ্গা হবে সাঁওতাল আর রিফিউজিতে। আর-একবার দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলে—সাঁওতালরা কি তাকেও মারবেনা? সেও তো আসলে রিফিউজিই। এক হয়, এখনই যদি চুপি-চুপি পালিয়ে গিয়ে রিফিউজি কলোনির মধ্যে ঢুকে পড়া

যায়—তাহলে হয়তো প্রাণে বাঁচবে। কিন্তু ব্যাপারটা টের পেলে সাঁওতালরা তো রাগের চোখে প্রথমেই তার দোকানবাড়ি ভাঙবে। এত সাধের, পরিশ্রমের, কষ্টের গড়া দোকান।-সাঁওতালরা এখনো তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি।

আর নয়তো, দোকান-প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে যদি সাঁওতালদের পক্ষ নেয়—চেঁচিয়ে লখার নামে, রিফিউজিদের নামে গালাগালি করে চেঁচিয়ে, যদি বলে ঐ রিফিউজিদের উচিতশিক্ষাই দেওয়া উচিত—তাহলে হয়তো সাঁওতালরা খুশি হবে। কিন্তু হাজার হোক, রিফিউজিরা তার জাতভাই—তাদের নামে ওরকম বলা যায়? আর রিফিউজিরাও কম শক্তিশালী নয়—ও-কথা শুনলে তারাও আজ না হোক কাল এসে ঝামেলা করবেনা? একি খিটকেল বলুন তো! সত্যি, 'খিটকেল' ছাড়া অন্য কোন শব্দ নিয়ে ব্যাপারটা বুঝানো যেতনা!

বন্ধু ইন্দ্রনাথ বলল, থানা নেই এখানে? থানায় খবর দিননা!

সুরোদিদির বুদ্ধি কি কম, সে খেয়াল কি তার নেই? চুপি-চুপি একজনকে সাইকেল দিয়ে থানায় খবর পাঠিয়েছি কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু কারু দেখা নেই। দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু না হলে দু-একজন লোক খুন-জখম না হলে—আগে কি কখনো পুলিশ আসে? কেউ সেরকম দেখেছে কখনো?

সাঁওতালদের আলোচনা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এবার তারা যুদ্ধে যাবেই বোঝা যাচ্ছে। একজন ডাকল, এ সুরোদিদি, ইদিকে শোন, তু তো দেখেছিস্ উঁ শালা লখাটো...

এইসময় পথের দিগন্ত কাঁপিয়ে আমাদের বাস এল। ইস্, মারামারিটা দেখা হলনা! ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলাম, কী এই বাসটা ছেড়ে দেবে নাকি? ইন্দ্রনাথ বলল, তুমি বলো কী করব? আমরা দুজনে কেউই মনঃস্থির করতে পারছিনা। পরের বাস আবার দুঘণ্টা বাদে। এই গরমে আরও দুঘণ্টা কি অপেক্ষা করা ঠিক হবে? যদি শেষপর্যন্ত মারামারি না হয়? না, আর দেরি করবনা—আমরা দুজনে ছুটে গিয়ে বাসে উঠে পড়লাম।

বাস একটু দূর যেতেই দেখলাম পথের ওপর আর-একটা দঙ্গল! এখানেও কিছু লোকের হাতে লাঠি-সোঁটা। এটা রিফিউজিদের দল। পাজামার ওপর হাওয়াই শার্ট-পরা ওই লোকটাই কি লখা? ওপাশ থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসতেই এরাও ক্রুদ্ধ চিৎকার দিয়ে উঠল। আমরা নেমে পড়ার সুযোগ পেলামনা—বাস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

এইসব মারামারিতে পরের দিন খবরের কাগজে পাঁচ-ছ লাইন খবর বেরোয় মাত্র। নিহতের সংখ্যা তিনের বেশি হলে পনেরো-কুড়ি লাইন। কিন্তু তাতে সুরোদিদির খিটকেলের কথা কিছুই থাকেনা। কোন শক্তিমান নাট্যকারের পক্ষেই শুধু ওর অন্তর্দ্বন্দ্ব ফোটানো সম্ভব। আমার সে-ক্ষমতা নেই।

৭

মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর লাগে, আমার চোখে, যখন তারা প্রবল বাতাসের স্রোতের বিপরীত দিকে হাঁটে। হু-হু করছে হাওয়া, চুল এলোমেলো এবং আঁচলটা পিছনের দিকে ডানার মতন উড়তে থাকে, মেয়েরা তখন বদলে যায়, তাদের চোখমুখ অচেনা মনে হয়। সেইরকম হু-হু করা বাতাসের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে একপলক তাকিয়ে বরুণাকেও আমার হঠাৎ সুন্দরী মনে হল। অন্য কোন সময় মনে হয়নি, একটু পুরুষালি ধরনের চেহারা বরুণার, বেশ লম্বা, গায়ের রং ফর্শার কাছাকাছি হলেও রাজপুতানিদের মতন চওড়া হাতের কবজি এবং নাকটা গুজিয়ার মতন ছোট্ট, আর বোঁচা। অন্যসময় সুন্দরী মনে হয়না, কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে বরুণাকে মনে হল বত্তিচেল্লির আঁকা 'থ্রি গ্রেসেস'-এর অন্যতমা। আমি বরুণার দিকে পাপচোখে আবার তাকালাম। কিছু একটা কথা বলা দরকার, তাই বললাম, দারুণ হাওয়া দিচ্ছে না?

বরুণা যেন অন্যজগৎ থেকে কথা বলছে, সেইভাবে উত্তর দিল, আঃ, আমার ইচ্ছে করে, সমুদ্রের ওপর একটা ছোট্ট ডিঙি নিয়ে একলা এ-রকম হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভেসে যাই।

কথা হচ্ছিল নদীর পাড়ে। পাশেই বিশাল নিষ্প্রাণ দামোদর। ইউনেস্কোর উদ্যোগে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল, গ্রামের অশিক্ষিত চাষী-মজুররা কথা বলার সময় কতগুলো শব্দ ব্যবহার করে, সাধু বাংলা তারা কতখানি বোঝে এইসব তথ্য সংগ্রহ করার। কলেজের কোন একটা পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমি বাই চান্স সেই চাকরি পেয়ে যাই। ন'জন ছেলে এবং পাঁচজন মেয়ের একটি দল মিলে আমরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরতাম, ইস্কুলবাড়িতে ক্যাম্প করা হতো। সেই দলের একটি মেয়ে বরুণা, তখন আমরা বর্ধমানের কলানবগ্রামে, শক্তিগড় অঞ্চলে। দলের আর-চারটি মেয়ে আর-চারশো মেয়েরই মতন, তারা ছেলেদের থেকে একটু দূরে আলাদা দল মিলে থাকে, লাজুক লতার মতন আড়ে-আড়ে চায়, হাসির কথায় চুপ করে থাকে, আবার অকারণে হাসে, অকারণে ভয় পায়, পদে পদে, 'ইস কী বিশ্রী কাদা, উঁঃ কী বিচ্ছিরি গন্ধ...'। দলের মধ্যে যে মেয়েটি সবচেয়ে সুন্দরী ছিল—তাকে আমরা ছেলেরা আড়ালে বলতাম, মিস পুঁটুলি, শাড়ি-ব্লাউজে জড়ানো একটা পুঁটুলির মতনই দেখতে ছিল তাকে। আমাদের বিকাশ মাঝে-মাঝে মন্তব্য করত, ইস, অতই যখন লজ্জা, তখন চাকরি করতে আসা কেন?

একমাত্র বরুণা ছিল আলাদা, ডাকাবুকো ধরনের, অহেতুক লজ্জার বালাই নেই, ছেলেদের সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটছে, ছোটখাটো খানাখন্দ দেখলে দিব্যি লাফিয়ে

পার হচ্ছে, কখনো-বা কাদার মধ্যে হাঁটু ডুবিয়ে সাঁওতালনির মতন হি-হি করে হাসছে। বরুণা বলত, আমি চাকরিটি নিয়েছি কেন জানেন? এই যে বাড়ির লোকজন ছাড়াই একা-একা বেড়াবার সুযোগ পেলাম। বেড়াতে আমার এত ভালো লাগে।

সেইসময় আমার একটা গুরুতর অসুখ ছিল। ঘন-ঘন প্রেমে পড়া। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে কোন গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, তার জানলায় বসে-থাকা কোন মেয়ের মুখ দেখেও এমন প্রেমে পড়ে যেতাম যে, মনে হতো, একে না-পেলে আমি বাঁচবনা! সাতদিন আহারে রুচি থাকতনা । সুতরাং বরুণার সঙ্গে যে আমি প্রেম করবার চেষ্টা করব, তাতে আর আশ্চর্য কী! বাকি ছেলেরা অন্য চারটি মেয়ের পিছনেই ঘুরঘুর, তাদের মুখের একটু হাসি বা চোখের ঝিলিক দেখবার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকত। বরুণাকে ওরা একটু ভয়-ভয় করত, তাছাড়া বরুণা বেশ লম্বা, অন্য ছেলেদের প্রায় সমান-সমান—দলের মধ্যে আমি একটু বেশি লম্বা ছিলাম বলে—আমার পাশেই বরুণাকে একটু-একটু মানাত। কিন্তু হায় হায়, বরুণার সঙ্গে আমার এক বিন্দুও প্রেম হলো না।

বলাই বাহুল্য, আমাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় দলপতি ছিলেন—আমরা যে-কাজের জন্য এসেছি সেটা সার্থক হচ্ছে কিনা দেখার বদলে—ছেলেরা-মেয়েরা সবসময় আলাদা থাকছে কিনা, এটা লক্ষ রাখাই ছিল যে তাঁর প্রধান দায়িত্ব। আমরা তাঁকে গ্রাহ্য করতাম না, এবং সবথেকে অগ্রাহ্য করত বরুণা। বরুণা অনবরত আমাদের মধ্যে চলে আসছে, খপ করে যখন-তখন হাত ধরছে, ইয়ার্কি করে পিঠে কিল, পুকুরপাড়ে পা ধুতে গেলে গায়ে জল ছিটিয়েছে—এমনকী সন্ধের পরও এসে বলেছে, চলুন-না এ গ্রামের শ্মশানটা দেখে আসি। কিন্তু গলার স্বর একটু গাঢ় করে কথা বলতে গেলেই বরুণা চোখ পাকিয়ে বলেছে, এই, ওকি হচ্ছে, ন্যাকামি? ইস, একেবারে গদগদ দেখছি!—না, ওরকম মেয়ের সঙ্গে প্রেমের কথা বলা যায়না, ওদের সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব।

বরুণার বাড়ির কথা একটু-একটু শুনেছিলাম। যৌথ পরিবার, জ্যাঠামশাই বিষম আচারনিষ্ঠ, গোঁড়া, বাবা—অধিকাংশ প্রৌঢ় মধ্যবিত্ত যেরকম হয়, কোন বিষয়েই কোন জোরালো মতামত নেই, মা বহুকাল হাঁপানিতে শয্যাশায়ী, দাদা কাঠের ব্যবসা ফেঁদেছে—আরও অনেকগুলো ভাইবোন। অর্থাৎ বরুণাদের বাড়িতে গিয়ে বরুণাকে দেখলে কোন বৈশিষ্ট্যই দেখতে পেতামনা নিশ্চিত, সব মেয়ের মতনই গুটি-গুটি কলেজ যায়—বাড়ি আসে, মাসিপিসির সঙ্গে নাইট শো-তে সিনেমা যায়, দাদার বন্ধুরা বাড়িতে এলে সে ঘরে ঢোকা বারণ। কিন্তু বাড়ির সঙ্গে খুব বোঝাবুঝির পর চাকরি নিয়েছে, আমাদের দলপতি

নীতীশদা ওর কাকার বন্ধু—তিনি ওর ওপর নজর রাখবেন এই শর্তে। বাড়ি থেকে সেই প্রথম আলাদা বেরিয়েছে বরুণা, তার চরিত্র আমূল বদলে গেছে, পায়ে-পায়ে ওর চঞ্চলতা। বরুণার মধ্যে একটা প্রবল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা দেখেছিলাম।

বরুণা বলত, পৃথিবীতে কত জায়গা আছে, আমার ইচ্ছে করে একা-একা ঘুরে বেড়াই। কোন একটা অচেনা পাহাড়ের চূড়ায় উঠছি, আঃ, ভাবতে যা ভালো লাগে!

আমি বলতাম, ইস্, মেয়ে হয়ে শখ কত!

বরুণাব চোখ ঝলসে উঠত। তীব্র স্বরে বলত, কেন, মেয়েরা বুঝি পারেনা? ছেলেরাই সব পারে? দেখলাম তো কত ছেলে মেয়েরও অধম। দেখবেন, আমি একদিন আফ্রিকা চলে যাব, একটা নতুন নদী কিংবা জলপ্রপাত আবিষ্কার করব!

আমি হা-হা-করে হাসতাম। বলতাম, দেখা যাবে! বড়জোর স্বামীর সঙ্গে হুড্রু জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া কিংবা বাবা-মার সঙ্গে এলাহাবাদের ত্রিবেণী—এর বেশি না!

বরুণা তখন রাগের চোখে দুম করে আমার পিঠে এক বিরাশি সিক্কা কিল!

আল্পস পাহাড়ের উচ্চতা মিসিসিপি নদীর দৈর্ঘ্য ওর মুখস্থ ছিল। হিটাইট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ব্যাপারে একজন সুইডিস মহিলার অভিযানের কথা ও আমাকে শুনিয়েছিল। বরুণাও ছেলেমানুষের মতন কল্পনা করত, ও নিজেও একদিন মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা হিমালয়ের জঙ্গলে কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলবে।

সেবার আমাদের দলে বরুণা সত্যিই একটা অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হয়েছিল। মরা দামোদরের পাড়ে আমরা দুপুরে এসে থেমেছি। বিষম হাওয়া দিচ্ছে, মেঘলা আকাশ। প্রত্যেকের দশজন করে চাষীকে ইন্টারভিউ করার কথা, আসবার পথে, একটা বাজার দেখে তা আমরা সেরে ফেলেছি। শেষ শীতের শুকনো দামোদর —বিরাট চাওড়া—কিন্তু বেশিরভাগই বালি দেখা যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে জল। আমরা ঠিক করলাম, হেঁটে দামোদর পার হব। বিদ্যাসাগর মশাই নাকি বর্ষার দামোদর সাঁতরে পার হয়েছিলেন, আমরা শীতের দামোদর হেঁটে রেকর্ড করব। তখন 'আওয়ারা' বইটা সদ্য রিলিজ করেছে, আমি আর বিকাশ রাজকাপুরের ভঙ্গিতে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নিলাম। হঠাৎ বরুণা বলল, আমিও যাব! দলপতি নীতীশদা আঁতকে উঠে বললেন, না, কক্ষনোনা, বরুণা যাবেনা। বরুণা ততক্ষণে আঁচল কোমরে বেঁধেছে, বলল যাবই! নীতীশদা বললেন, না বলছি! অনেক জায়গায় কোমর এমনকী বুকজল। বরুণা বলল, তা হোক, আমি সাঁতার জানি।

ঐ তো চাষীর মেয়েরা পার হচ্ছে। নীতীশদা বললেন, ওরা ঠিক-ঠিক জায়গা চেনে। এক-এক জায়গায় দারুণ স্রোত আছে।... বরুণা, যেয়োনা বলছি, তাহলে তোমার বাবাকে আমি নালিশ করতে বাধ্য হব! বরুণা এবার ঠোঁট উল্টে বলল, করুন গে যান, আমার বয়ে গেল।—ততক্ষণে সে ঢালু পাড় দিয়ে নামতে শুরু করেছে!

প্রথমে বালি, বালির ওপর দিয়ে আমরা তিনজনে ছুটতে লাগলাম। বরুণার শাড়ি হাওয়ায় ফুলে উঠে পত্ পত করে উড়ছে! খুশিতে ওর মনখানা উদ্ভাসিত সুশ্রী। আমারও এমন ভালো লাগছিল যে, আমি ল্যাং মেরে বিকাশকে বালির ওপর ফেলে দিয়ে দুজনে গড়াগড়ি করলাম, বরুণা মুঠোমুঠো বালি আমাদের গায়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। পাড়ে দাঁড়িয়ে বাকি সবাই দেখছে—ওরা ভদ্র, সভ্য, ওরা মাটিতে গড়াগড়ি দেবার কথা চিন্তাই করতে পারেনা। একটু পরেই জলের ধারার কাছে পৌঁছোলাম। ঠাণ্ডা টলটলে জল—অঞ্জলি ভরে মুখে ছিটোলাম তিনজনেই, তারপর নেমে পড়লাম। বরুণা শাড়িটা হাতে ধরে উঁচু করে নিল। ক্রমশ-ক্রমশ জল হাঁটু ছাড়াল—তখন বরুণা শাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, ভিজুক গে।

সেই জল ছাড়িয়ে আবার বালি—ওপর থেকে বোঝা যায়না, কত চওড়া নদীর খাত। আবার বালি ছাড়িয়ে জল। এবার জল উরু ছাড়িয়ে গেল—জল ঠেলার সাঁ সাঁ শব্দ, বরুণা আনন্দে একেবারে খল খল করছে, একবার হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়ে আমার হাত চেপে ধরল। আমি ওর কাঁধ ধরে বললাম, এবার দিই ডুবিয়ে? ও বলল, ইস, আসুন-না দেখি, আমারও গায় কম জোর নেই।

কোমর ছাড়িয়ে প্রায় বুক পর্যন্ত জল। বিকাশ বলল, জল আরও বাড়বে নাকি? বরুণা সেকথা গ্রাহ্য না-করে উত্তর দিল, এত ভালো লাগছে, আমরা যেন ওপারে কী আছে জানিনা, যেন একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি!—হাওয়া খুব জোর, জলেও স্রোতের টান লাগল, আর ব্যালান্স রাখা যাচ্ছেনা, বিকাশ ভয়ে-ভয়ে বলল, হঠাৎ জোয়ার-টোয়ার এল নাকি! আমি কিন্তু সাঁতার জানিনা। বলতে-বলতেই বিকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আমাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, আমি বললাম, আরে ওকি করছিস! বরুণা বলল, সাঁতার জানেননা তো এলেন কেন! বিকাশ বলল, চলো আমরা ফিরে যাই। বরুণা বলল, মোটেইনা! আমার দিকে ফিরে বলল, আপনি তো সাঁতার জানেন, আসুন আপনি আমি দুজনেই যাই! বিকাশ বলল, নিলু, আমাকে আগে এপাড়ে পৌঁছে দিয়ে যা! আমি পা রাখতে পারছিনা! দুচোখ ভরা বিদ্রূপ নিয়ে বিকাশের দিকে তাকাল বরুণা। তারপর সাঁতারের ভঙ্গিতে জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে বরুণা বলল, আমি তাহলে একাই চললাম।

চাকরিটা ছিল মাত্র তিন সপ্তাহের। শেষ হয়ে যেতে তারপর আর কেউ কারো

খোঁজ রাখিনি। শুধু বিকাশের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা হয়। কিছুদিন আগে বিকাশ বলছিল, তোর সেই দেবী চৌধুরানী মার্কা মেয়েটাকে মনে আছে? বরুণা? সেদিন আমাদের এক কলিগের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, তার বউ সেই বরুণা। কী চেহারাই হয়েছে! চেনা যায়না—এর মধ্যেই তিনটে বাচ্চা।

তার কিছুদিন পর আমিও একদিন বরুণাকে দেখেছিলাম দুপুরবেলা চলন্ত ট্যাক্সিতে। টাক মাথায় আলু-আলু মার্কা একজন লোক, নিশ্চয়ই বরুণার স্বামী, মুটিয়েছে বলে বরুণার মুখখানাও ভোঁতা ধরনের, সঙ্গে একটা দেড় বছরের ছেলে, খুব সম্ভবত হিন্দি সিনেমার দুর্গম পাহাড় কিংবা নির্জন হ্রদের দৃশ্য দেখতে যাচ্ছে। না চেনার কী আছে, এইটাই তো স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা!

বরুণার কথা আজ আবার মনে পড়ল, কেননা, কাগজে দেখছিলাম আটটি বাঙালি মেয়ে হিমালয়ে উঠে রন্টি শৃঙ্গ জয় করেছে। ভাবছি এই খবরটা পড়ে বরুণা খুশি হবে, না দুঃখিত হবে?

৮

এই সময়টায় ওদের দেখলেই চেনা যায়, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই চারমাসে বাংলাদেশে যে হাজার-হাজার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, এখন এই শরৎকালে তাদের দেখলেই বোঝা যাবে—তারা অন্যসব মেয়ের চেয়ে আলাদা। তারা আর কুমারী নয়, তারা এখনও গিন্নী নয়, তারা নতুন বউ। তাদেব পা এখন পৃথিবীর মাটি ছোঁয় কী ছোঁয়না।

তাদের মাথায় সিঁথির সিঁদুর বড় বেশি গাঢ়, অনভ্যস্ত হাতে সিঁথি ছড়িয়ে চুলের মধ্যেও ছড়ানো সিঁদুরের গুঁড়ো—সেইসঙ্গে মুখেও একটা অরুণ আভা সবসময়। হাতের সোনার গয়না অন্যদের চেয়ে বেশি ঝকঝকে, এখন প্রত্যেকদিন তারা এক-একটা নতুন শাড়ি পরে রাস্তায় বেরোয়, পায়েব চটিজোড়াও নতুন, ব্লাউজ নতুন। অর্থাৎ নতুন বউদের সবই নতুন। গায়ের চামড়াও নতুন রং ধরেছে মনে হয়, ঠোঁটে নতুন রকমের হাসি, পাশের নতুন লোকটির দিকে মাঝে-মাঝে চোরা চাহনি—এইসব মিলিয়ে ওদের আলাদা করে চেনা যায়।

এই লগনশা'য় আমার চেনা পাঁচটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। দুজন নেমন্তন্ন করেছিল, আর তিনজন ভুলে মেরে দিয়েছিল। তা নেমন্তন্ন করুক আর না-করুক, প্রত্যেকের বিয়ের দিনই আমি বিষণ্ণ বোধ করেছি। সত্যিকথা বলতে কী, পৃথিবীর যাবতীয় কুমারী মেয়ের বিবাহ সংবাদেই আমি ব্যক্তিগত ক্ষতি অনুভব করি।

যেমন, পৃথিবীতে তো প্রতিদিন অসংখ্য শিশু থেকে বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু কোন কুমারী মেয়ের মৃত্যুর কথা শুনলে আমি আমার বুকে দারুণ শেলের আঘাত পাই। মনে হয়, পৃথিবীর পক্ষে এ-ক্ষতি অপূরণীয়।

যাইহোক, যে-পাঁচজনের বিয়ে হয়ে গেল, তাদের মধ্যে দুজন বিয়ের পরই চলে গেল কলকাতার বাইরে, একজন শিলং আর অন্যজন মাদ্রাজ—সুতরাং আমার চোখে তাদের কুমারী জীবনের ছবিই জেগে রইল। বাকি তিনজনের মধ্যে রত্নার বিয়ে হয়েছে এক বনেদী পরিবারে—তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা কম। দেখা করার জন্য আমি যে খুব উদগ্রীব—তাও তো নয়, আমি তো আর একসঙ্গেই সব কুমারীর ব্যর্থ প্রেমিক হতে পারিনা। ওরা কেউ আমার প্রেমিকা ছিলনা, কিংবা আমাকে প্রেমিক হবার সুযোগ দেয়নি, তবু ওদের বিবাহজনিত আমার যে বিষণ্ণতা, সেটা একটা অন্যরকম ব্যাপার—আমি তার ব্যাখ্যা করতে পারবনা।

স্নিগ্ধার সঙ্গে দুবার দেখা হল এরমধ্যে। স্নিগ্ধার বরটি বেশ নাদুসনুদুস, মুখে একটা বিগলিত হাসি, তার পাশে স্নিগ্ধা যেন হাওয়ায় উড়ছে। চাঁপারঙের বেনারসীর আঁচল হাওয়া থেকে ফিরিয়ে আনতে-আনতে স্নিগ্ধা হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে অযাচিতভাবে উচ্ছল হয়ে বলল, আরে আপনি? কী খবর? বিয়েতে আসেননি কেন?

স্নিগ্ধা ভুলে গেছে যে ও আমাকে নেমন্তন্নই করেনি, কিন্তু সেকথা তো মনে করিয়ে দিতে পারিনা এখন। তাই আমাকে লাজুক মুখে বলতে হল, না, ইয়ে, খুব দুঃখিত, খুব যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু একটা বিশেষ কাজ—

স্নিগ্ধা তার বরের দিকে ফিরে বলল, ঐ যে টুটু মাসি, টুটু মাসিকে মনে আছে তো? যিনি সেই বউভাতের দিনে একটা কইমাছ পাড় শান্তিপুরী শাড়ি পরে এসেছিলেন, সেই যে আসানসোলে ওঁর বাড়িতে যাবার জন্য আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন—তার দেওরের ছেলে নীলুদা, আমাদের সঙ্গে একবার থিয়েটার করেছিলেন। নীলুদা, আসবেন একদিন আমাদের বাড়িতে, নিউ আলিপুরের ও ব্লক, এ-সপ্তাহে না, সামনের মাসে একদিন—আমরা হায়দারাবাদে হনিমুনে যাচ্ছি (এইসময় একটু মুচকি হাসি)—ফিরে এলে তারপর—

স্নিগ্ধার কী বদল হয়েছে এই ক'দিনে! আগে স্নিগ্ধা ছিল খুব শান্ত ধরনের মেয়ে, বেশি কথা বলতনা, কখনো জোরে শব্দ করে হাসেনি—বিয়ের একমাসের মধ্যেই স্নিগ্ধা অজস্র কথায় উচ্ছ্বসিত। একাই সবকিছু বলে যাচ্ছে, হায়দারাবাদে হনিমুনের কথা, নিউ আলিপুরে ওদের ফ্ল্যাট কত সুন্দর, 'ওর' অফিস থেকে শিগগিরই গাড়ি দিচ্ছে—স্নিগ্ধা যেন তার গয়নার ঐশ্বর্য এবং শাড়ির জৌলুষের সঙ্গে-সঙ্গে কায়দা আমাকে দেখিয়ে, দ্যাখো, আমার স্বামীও কত ভালো লোক

—তোমার মতন একটা রোগা আর কালো চেহারার বাউণ্ডুলের তুলনায় আমার স্বামী কীরকম রূপবান দেবতা।

আশ্চর্য মেয়েদের মনস্তত্ত্ব। আমি কি কোনদিন স্নিগ্ধার পাণিপ্রার্থী ছিলাম? কক্ষনোনা! তাহলে আমার কাছে ওর এত স্বামীগর্ব করে কী লাভ? ও বুঝি হিংসেয় আমার বুক ফাটিয়ে আনন্দ পেতে চায়? কিন্তু এই ফাটা বুক আর কত ফাটবে?

পূরবী আবার অন্যরকম। পূরবীর একটু-একটু দুর্বলতা ছিল আমার সম্বন্ধে। আমিও তাতে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েছি। কোন-কোন নম্র গোধূলিতে বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে পূরবী আর আমি মৃদুস্বরে কথা বলেছি। শুধু কথাই, তার বেশি আর এগোয়নি। যেসব স্থান পূরবীর ভালো লাগত, সেগুলো আমার প্রিয়। হাজারীবাগের ক্যানারি হিল থেকে দেখা সূর্যাস্ত আমার ভালো লেগেছিল, পূরবীর সঙ্গে তো মিলে গেল। কোথাও ভিড়ের মধ্যে আমাকে দেখলে পূরবী এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলত, কখনো-বা হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত ভিড় থেকে আড়ালে। তবে শুধু ঐটুকুই, তার বেশিনা।

সেইরকমই এক নম্র গোধূলিতে পূরবীর সঙ্গে আমার দেখা হল রাসবিহারীর মোড়ে। বিয়ের পর পূরবীকে এই প্রথম দেখলাম। সিঁদুরের আভায় তার মুখখানি আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। পূরবীর স্বামী ছিল না, পাশে যে মেয়েটি—সে বোধহয় তার ননদ বা ঐরকম কিছু, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল পূরবীর—সঙ্গে-সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল—একটা কথাও বললনা, না-চেনার ভঙ্গিতে চলে গেল। আমি আমার ঠোঁটের উদ্যত কথা ফিরিয়ে নিলাম। আমি পূরবীকে অভিনন্দন জানাতে যাচ্ছিলাম—কী ক্ষতি হতো পূরবীর—একটা কথা বললে! পূরবী কোনদিনই তো এমন আড়ষ্ট সংস্কারগ্রস্ত ছিলনা। কিন্তু একটি মেয়ে, কুমারী অবস্থায় যার সঙ্গে আমি কোনদিন একটা কথাও বলিনি, নতুন বিবাহিতা হিসেবে তাকে যেদিন দেখলাম, সেদিন আমি একমুখ হেসে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে, বললাম, আরে, বাঃ কবে হল? মেয়েটি উত্তর না দিয়ে লাজুকভাবে হাসল।

মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনদিন আলাপই হয়নি, আমি তার নামও জানিনা। মেয়েটিও আমার নাম জানেনা। দীর্ঘ তিনবছর মৌলালির মোড়ে একটা অফিসে আমি চাকরি করতাম—প্রতিদিন ঠিক দশটা বেজে দুশে বাসে উঠতাম শ্যামবাজার থেকে। রামমোহন লাইব্রেরির সামনে থেকে মেয়েটি। প্রত্যেকদিন ওকে দেখেছি, প্রত্যেকদিন রামমোহন লাইব্রেরির স্টপ এলে আমি মেয়েটির জন্য উঁকি মেরে দেখতাম। একটু কালো, ছিপছিপে চেহারা লাবণ্যমাখা মুখে মেয়েটিকে প্রত্যেকদিন দেখা এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে, এক-আধদিন ওকে না-দেখলে চিন্তিত হয়ে পড়তাম। মেয়েটিও দেখত নিশ্চয়ই আমাকে—আমি দরজার সামনে ঝুলন্ত

অবস্থা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে মেয়েটির জন্য জায়গা করে দিতাম। এক-একদিন কণ্ডাকটরকে চেঁচিয়ে বলেছি, রোককে, রোককে, জেনানা হ্যায়! যেন আমারই কোন আত্মীয়া। কিন্তু কোনদিন একটাও কথা হয়নি।

আজ মেয়েটিকে নতুন সিঁদুর-পরা ও নতুন বেনারসী-পরা চেহারায় সিনেমা হলের সামনে দেখে আচমকা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আরে! বাঃ! কবে হল? মেয়েটি লাজুকভাবে মুখ নিচু করল—তারপর আবার মুখ তুলে বলল, গতমাসের সাত তারিখে। মেয়েটি আবার হাসল, আমিও হাসলাম। জীবনে আর আমাদের কোন কথা হবেনা—শুধু একঝলক অনাবিল খুশির বিনিময় হয়ে গেল।

৯

বললাম, তোমার কপালের টিপটা ব্যাঁকা।

মেয়েটি বলল, যাঃ, মোটেইনা।

বলার সময় মেয়েটি হাসেনি। বরং যখন 'যাঃ' বলল, সেটা শোনাল ছোট্ট ধমকের মতো। আমি তখনও খরচোখে ওর ভ্রূসন্ধিতে তাকিয়ে আছি, সম্মোহনকারীর ভঙ্গিতে। চোখ না-সরিয়েই মৃদুস্বরে টেনে-টেনে ঘরের অন্যান্য লোকেরা যাতে ঠিক শুনতে না-পায় এমনভাবে বললাম, আমি এ-পর্যন্ত যত সুন্দরী মেয়ে দেখেছি, সকলেরই কপালের টিপ ব্যাঁকা হয়। কখনোই ঠিক মাঝখানে বসেনা।

মেয়েটি মুখ নিচু করল। আমার এই স্তুতি একটু অপ্রত্যক্ষ বলে মুখ নিচু করতেই হয় এসময়ে। কোন উত্তর দেওয়া যায়না। আমি তখনও দ্বিধায় দুলছি। আর-একটু কী বলব? ঠিক আমার যা মনের কথা? কিন্তু বলার বিপদও আছে —এক-একসময় প্রতিফল এত খারাপ হয়! তবু আমিও মুখ নিচু করে বললাম, কেন ঠিক হয়না জানো? কেন? এবার মেয়েটি স্পষ্টই হাসল। উত্তর শোনার প্রতীক্ষায় যেরকম হাসতে হয়।

বললাম, কারণ, সুন্দরী মেয়েরা যখন আয়নার সামনে টিপ পরতে যায়, তখন তারা নিজের মুখ সবচেয়ে নিবিড়ভাবে দেখে। স্নো-পাউডার মাখা কিংবা চুল আঁচড়ানোর সময় আয়নায় দাঁড়ানোর সঙ্গে এর তুলনাই হয়না। অন্যসবসময়ই তারা আলগাভাবে দেখে, কিংবা দেখে সারা শরীর—অথবা ব্লাউজের হাতাটা কুঁচকে গেছে কিনা, কানের পাশে পাউডারের দাগ—এইসব। কিন্তু শুধু মুখখানা—সম্পূর্ণ মুখও নয়, দুই চোখ, নাকের সামান্য অংশ, ঈশ্বরের কবিতার খাতার মতো নির্মল

কপাল (এইটা বলার সময় আমি টুক করে একটু হেসে নিলাম)—মুখের যেটুকু সবচেয়ে সুন্দর অংশ, মেয়েরা সেটা দেখতে পায়। দেখে অবাক হয়ে যায়, হাত কেঁপে যায়, ঠিক জায়গায় টিপ বসেনা। পৃথিবীর কোন সুন্দরী মেয়ের এপর্যন্ত বসেনি, আমি জানি। টিপ পরতে গিয়ে প্রত্যেক মেয়েই একবার করে নার্সিসাস হয়ে যায়। অবশ্য খুব গভীর দুঃখ পেলেও শুনেছি কোন-কোন মেয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এরকম নিবিড়ভাবে নিজেকে দেখে। কিন্তু তাদের কথা আমি ঠিক জানিনা।

এবার মেয়েটি কাচের গ্লাস ভাঙার মতন বেশ জোরে হেসে উঠল। বলল, ইস, বাকি সব সুন্দরীদের কথাই যেন জেনে বসে আছেন। খুব চালিয়াতি, না?

আমিও বেশ জোরে হাসলাম। আমার বিপদ কেটে গেল। মনের ভেতরটা খুব পরিষ্কার এবং ভালো লাগতে লাগল।

না, এইভাবে কোন গল্প শুরু করতে যাচ্ছিনা। এ-গল্পের এখানেই শেষ এবং কোন ক্রমশ নেই। আমি আমার একটি ছোট্ট বিপদমুক্তির ইতিহাস জানালাম। আমার জীবনটাই বিপদে ভরা, প্রত্যেক পায়েপায়ে আমাকে বিপদের হাত থেকে সাবধান হয়ে চলতে হয়। তার মধ্যে একটা বিপদ, কোন নারী বা বালিকার রূপের প্রশংসা করার পর তার মুখের কথা শুনে আমার কী অবস্থা হবে। আমি সবসময় ভয়ে-ভয়ে থাকি। এ-ভয় শারীরিক নয়। মেয়েটি আমাকে চপেটাঘাত করবে, না তার ব্যায়ামবীর দাদা এসে আমার হাত মুচড়ে দেবে, বা তার স্বামী বা হবুস্বামী এসে আমার সামনে রাগে নাকঝাড়ার আওয়াজ করবে, এরকম কোন আশঙ্কার কারণ আমার নেই! আমার স্তুতি নির্লোভ—আমার আশঙ্কা মেয়েটির উত্তর যদি আমার মনঃপূত না হয়। আসলে রূপের চেয়েও রূপসীর মুখের ভাষারই বোধহয় আমি বেশি ভক্ত। যাকে আগে সুন্দর মনে হয়েছিল, অনেকসময় তার মুখের উত্তর শুনে আমার তাকে কুৎসিত মনে হয়েছে।

অথচ, রূপ দেখলে প্রশংসা বা স্তুতি না-করেও পারিনা। প্রশংসার ভাষা এমন কিছু কঠিন নয়—আমি যদিও একটু কাঁচা—তবে অনেকেই খুব সুন্দর সুরুচি-সম্মতভাবে প্রশংসা করতে জানে। কিন্তু সবচেয়ে শক্ত প্রশংসার উত্তরে কী বলা হবে—সেই ভাষা। প্রশংসার উত্তরে চুপ করে থাকা উচিত নয়, সেটা দৃষ্টিকটু, তাহলে মনে হবে, অহংকারে কথাটা গ্রাহ্যই করা হয় না। আবার প্রশংসায় বিগলিত হয়ে পান্তুয়া-মুখে-পোরা গলায় উত্তর শুনলেও গা জ্বলে যায়।

আমি প্রায়ই ভাবি, কোন নবীন লেখককে যখন কোন প্রবীণ লেখক প্রশংসা করে, তখন নবীনটি কী করবে? চুপ করে বসেও থাকতে পারেনা, হেঁ-হেঁ ধরনের হাসতেও পারে না—তাহলে সেই সময়টি নিশ্চয়ই তার খুবই অস্বস্তি বা সংকটের

সময়। অবশ্য আমার এ-ভাবনা নেই—কাজ তো খই ভাজার মতন, কারণ এরকম সৌভাগ্য আমার এ-পর্যন্ত হয়নি, অদূর-ভবিষ্যতে এমন সম্ভাবনাও নেই যে, আগে থেকে রিহার্সাল দিয়ে নেব।

তবে প্রশংসার সময় সবচেয়ে অরুচিকর জিনিশ, প্রশংসার উত্তরে প্রতিপ্রশংসা। আমি যদি কারুকে বলি আপনার অমুক ব্যাপারটা খুব সুন্দর তার উত্তরে যদি শুনি, আপনারও তো অমুকটা আ-হা-হা—তাহলেই আমার গা রি-রি করে। নেমন্তন্নবাড়িতে কোন একটা রান্নার প্রশংসা করলেই তার পাতায় সেই পদ আরও খানিকটা এনে ঢেলে দেওয়া হয়—এই নিয়মটি স্রেফ কুৎসিত। একমাত্র মেয়েরাই, অধিকাংশ মেয়েরাই ন্যায্যভাবে প্রশংসা গ্রহণ করতে জানে। কারণ, মেয়েদের ক্ষেত্রে ঐ প্রতিপ্রশংসা করার ব্যাপার নেই। একটি পুরুষ যদি একটি নারীর রূপের প্রশংসা করে উন্মুক্ত গলায় তার উত্তরে কোন নারীই পুরুষের রূপের প্রশংসা করবেনা। কারণ মেয়েরা জানে রূপের প্রশংসা তাদের সবসময়ই প্রাপ্য, তাদের দাবি—কিন্তু প্রশংসা পাবার জন্য কোন পুরুষকে অনেক যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তাছাড়া মেয়েদের প্রশংসা হয় নিন্দাচ্ছলে—অর্থাৎ ব্যাজস্তুতি। অন্নপূর্ণা যেমন তাঁর স্বামী সম্পর্কে বলেছিলেন, কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন। এখনও সব মেয়েরাই এরকম ভাষা ব্যবহার করে। কোন মেয়ে যদি কোন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে দাড়ি না-কামানোই বুঝি স্টাইল হয়েছে আজকাল? কী বিশ্রী খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—ঠিক কয়েদীর মতো চেহারা হয়েছে।—তাহলেই বুঝতে হবে মেয়েটি আসলে ছেলেটির মুখের প্রশংসা করছে। ব্যাজস্তুতি ছেলেরা সহ্য করেও বোঝে, মেয়েরা সহ্যই করতে পারেনা। আবার সোজাসুজি স্তুতিতে ছেলেরা একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়, নাকচোখ পর্যন্ত গোল হয়ে সাবা মুখ গোল হয়ে যায়, কোন কথাই বলতে পারেনা। কিন্তু মেয়েরা গ্রহণ করতে পারে, রূপের প্রশংসা শুনে মেয়েরা আরও রূপসী হয়ে ওঠে সেইমুহূর্তে।

মনে করা যাক, একটি সাহেবী কায়দার নেমন্তন্ন বাড়িতে এক মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি একটি কোঁকড়ানো ফুলকাটা জামা পরেছেন। মহিলার কপালের দুপাশে চূর্ণ চুল জংলী ফুলের মতো স্তবক বেঁধে আছে। ঘুরতে-ঘুরতে তাঁর সামনে এসে আমি দাঁড়ালাম হয়তো। আমি অনেককথা বলতে পারতাম, কেমন আছেন, অমুকের সঙ্গে কি দেখা হয়, অমুক ফিল্ম দেখেছেন কিনা, অমুক লেখকের লেখা—ইত্যাদি অনেক বাজে কথা। কিন্তু যে কথাটা আমার প্রথমেই মনে এল, এক মিনিট দ্বিধা করে আমি সেই কথাই বললাম, আপনার জামার সঙ্গে আপনার সুন্দর চুল—অথবা আপনার সুন্দর চুলের সঙ্গে আপনার জামা—চমৎকার মানিয়েছে। মনে হচ্ছে, ভিড়ের মধ্যেও আপনি আলাদা। মহিলা

মুখ টিপে হেসে বললেন, আপনাকে কি আমি ধন্যবাদ দেব?

আমি আঁতকে উঠলাম। মেয়েদের মুখ থেকে ধন্যবাদ শুনলে আমার মনে হয়, কেউ যেন আমার শরীরে গরম লোহার শিক ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আর এই সাহেবী কায়দার নেমন্তন্নে ধন্যবাদের তো ছড়াছড়ি।

মহিলা বললেন, এসব জায়গায় ধন্যবাদ দেওয়াই রেওয়াজ। কিন্তু আপনাকে আমি কিন্তু ধন্যবাদ জানাবনা।

এই বলে তিনি মুখের চাপা হাসিটুকুই রেখে দিলেন কিছুক্ষণ। আমার বিপদ কেটে গেল।

আমার নিতান্ত ভাগ্যদোষে এবং ঘটনাপরম্পরায় প্রায়ই কিছু কিছু সাহেব-মেমের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। সাহেব-মেমদের সঙ্গে কথাবার্তায় কমা ফুলস্টপের মতো প্রায়ই 'ধন্যবাদ' বসিয়ে যেতে হয়, আমি সবসময় সজাগ থাকি। কিন্তু পারতপক্ষে আমি মেমসাহেবদের এড়িয়ে যাই, কথাবার্তা বিশেষ বলিনা। যদি-বা কখনো পাকে-চক্রে কথা বলতেই হয়, কিছুতেই কোন মেমের রূপের প্রশংসা করিনা কখনো। কারণ জানি রূপের প্রশংসা শুনলে কোন মেমের মুখে লজ্জার আভা আসবেনা, অর্ধস্ফুট হাসি দেখা দেবে না, মুখের একটি রেখাও না-কাঁপিয়ে তিনি বলবেন, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তারপরই আবার অন্যকথা। আমার কাছে এ-জিনিশ ভয়ংকর। সুতরাং মেমসাহেবদের রূপের প্রশংসা আমার মুখ দিয়ে বেরয়না। আর সত্যিকারের রূপসী মেমসাহেবদের মধ্যে ক'জন আছে কে জানে —আমার তো একটিও চোখে পড়েনি। এ-কথাটাও আমি সুযোগ পেলেই কোন বাঙালি মেয়েকে জানিয়ে দিই!

১০

রামায়ণের রাবণ সীতাহরণের চেয়েও বড়ো অন্যায় কাজ করেছিলেন একটি। তখনকার ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুযায়ী রূপসী নারীহরণ হয়তো খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলনা। তাছাড়া, সীতাহরণের প্রধান সার্থকতা, ঐ ঘটনাটি না-ঘটলে রামায়ণ এরকম একটি মহৎ কাব্য হয়ে উঠতে পারতনা। কিন্তু রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করতে গিয়েছিলেন কেন? সব ছদ্মবেশই যখন তিনি ধরতে পারতেন—তখন রামের ছদ্মবেশে গণ্ডি পার হলেই পারতেন!

রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরার পর থেকেই মানুষ আর কোন সন্ন্যাসীকে ঠিক বিশ্বাস করেনা। সব সন্ন্যাসীকেই প্রথমে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলে ভাবে।

সাধুসন্ন্যাসীদের সম্পর্কে আমার একটু দুর্বলতা আছে। আমার একেবারেই ধর্মবিশ্বাস নেই, নাস্তিকস্য নাস্তিক যাকে বলে, কিন্তু সন্ন্যাসীর জীবন আমাকে আকৃষ্ট করে। কোথাও শিকড় গাড়েনি, কোন আসক্তি নেই, সবকিছু ছেড়ে এই বিশাল বিশ্বে একা হয়ে গেছে এইসব মানুষ। গেরুয়া রংটার মধ্যেও খানিকটা ঔদাসীন্যের ছোঁয়া আছে। অবশ্য চেলাচামুণ্ডা বা ভক্তদের মাঝখানে বসে থাকেন যেসব সাধু তাঁদের সম্পর্কে আমি উৎসাহহীন। কিংবা কলকাতায় যেসব বিখ্যাত সাধু বা মোহন্ত মাঝে-মাঝে এসে ওঠেন—আর তাঁর বাড়ির সামনে বড়লোক ভক্তদের গাড়ির লাইন লেগে যায়—তাঁদের সম্পর্কেও আমার মনোভাব ব্যক্ত না করাই শ্রেয়। আমার ভালো লাগে একা-একা ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীদের—একটু ঈর্ষাও হয়, মনের কোন একটা ইচ্ছে উঁকি মারে—আমিও ওদের মতন বেরিয়ে পড়ি।

জানি, খুনী কিংবা চোর-ডাকাতরাও সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ঘোরে। কিংবা অনেক সাধুই আসলে গেরুয়া-পরা ভিখারি। অর্থাৎ সেই রাবণের ছদ্মবেশ। তবু প্রথম দেখলেই কোন সাধুকে আমার ভণ্ড হিসেবে ভাবতে ইচ্ছে করেনা, প্রথমে আমি তাদের বিশ্বাস করতেই চাই।

ট্রেনের থার্ড-ক্লাস কামরায় একদল ছেলে একজন সাধুকে ক্ষেপাচ্ছিল। এই সাধুটির বয়েস বেশি নয়, তিরিশের কাছাকাছি, খুবই রূপবান। সত্যিকারের গৌরবর্ণ যাকে বলে, টিকোলো নাক—তবে দাড়ি ও জটার বহর আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, কোন সিনেমার নায়ক বোধহয় শুটিং-এর জন্য সাধু সেজেছে। তা অবশ্য নয়, আশেপাশে কোন ক্যামেরা নেই—তাছাড়া সন্ন্যাসীর মুখে যে নির্মল ঔদাসীন্য কোন সিনেমার নায়কের পক্ষে তা আনা খুব শক্ত। সাধুটি কোন জাত তা বোঝা যায়না। তবে বাঙালি নয়, বেশ দুর্বোধ্য হিন্দিতে কথা বলছিল। ওকে আমার খাঁটি সন্ন্যাসীই মনে হচ্ছিল।

একটি ছেলে তাকে বলল, ইস্, গা দিয়ে গাঁজার বিটকেল গন্ধ বেরুচ্ছে! এই যে সাধুবাবা, একটু সরে বসো-না।

সাধু ছেলেটির কথা শুনতে পেলনা। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

—কী বাবা, ভস্ম করে দেবে নাকি!

—ওসব এঁটেলু এখানে ছাড়ো! সাধু হয়েছ হেঁটে যেতে পারনা?

—গাঁজাফাঁজা থাকে তো বার করো!

—দাড়িটা আসল তো?

—টেনে দ্যাখ-না!

সন্ন্যাসীটিকে নিয়ে একটা তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। কেউ তার চুল-দাড়ি টেনে

দেখতে লাগল, কেউ তার ঝোলা হাতড়াতে লাগল, কেউ তাকে ঠেলে সিট থেকে মাটিতে বসাতে চায়। সাধুটি শান্ত ধরনের, রেগে উঠছেনা, দুর্বোধ্য হিন্দিতে কী যেন বলছে আর মাঝে-মাঝে হাত জোড় করছে। আমার কষ্ট হচ্ছিল ওর জন্য। তবে, রেলের কামরায় আট-দশটি ছেলে মিলে আজকাল যদি কিছু কাণ্ড শুরু করে, তার তো কোন প্রতিবাদ করা হয়না।

তবু আমি মৃদু গলায় বললাম, আহা থাক-না, বেচারী চুপচাপ বসে আছে—

একজন ছেলে বলল, ড্রব্লুটি'তে যাচ্ছে, তা আবার সীটে বসা কেন?

আর-একজন বলল, আপনি চুপ মেরে থাকুন! আপনার সঙ্গে কোন কথা বলেছি?

আমাকে চুপ করেই যেতে হল। আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে, ঐ আট-দশটি ছেলের মধ্যে অন্তত চার-পাঁচজন নিজেরা টিকিট কাটেনি। তবে, আজকাল নিজেরা একটা অন্যায় করেও অন্যদের সে-সম্পর্কে অভিযোগ জানানো যায়। মনে-মনে বললাম সাধুবাবা, কী আর করা যাবে, সব রাবণের দোষ!

ঐ ছেলেগুলোও নিশ্চয়ই আসলে খারাপ নয়। কলেজ থেকে ফেরার পথে একটু আমোদ করছে। আমোদটা যে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সেটুকু খেয়াল নেই। ঐ ছেলেগুলোর প্রত্যেকের সঙ্গে যদি আলাদাভাবে দেখা করা যায়, নিশ্চয়ই দেখব ভদ্র, বুদ্ধিমান ছেলে। আমারই মতন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তো, আমার চেয়ে আর আলাদা কী হবে? একা-একা এরা প্রত্যেকেই সহজ সাধারণ, কিন্তু একটা দঙ্গল হলেই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন একজন আর-একজনকে টেক্কা দিয়ে খারাপ হতে চায়। খারাপ হওয়াই আজকাল ফ্যাশান, নইলে বন্ধুদের কাছে মান থাকেনা।

কোথায় কোন পাড়ায় কবে দুটো পাজী ছেলে চাঁদা দিতে রাজি হয়নি বলে এক ভদ্রলোককে ছুরি মেরেছিল, তারপর থেকে চাঁদা আদায়কারী ছেলেদের সম্পর্কেই মানুষের একটা বিশ্রী ধারণা হয়ে গেছে। ঐ ছেলে দুটিও আসলে ছদ্মবেশী রাবণ। নইলে, পাড়ায় সবাই মিলে চাঁদা দিলে পুজো হবে, সবাই মিলে আনন্দ করবে—এইটাই তো স্বাভাবিক। বহুকাল ধরে এরকম চলছে, লোকে তো কখনো আপত্তি করেনি। তবে কারুর বেশি চাঁদা দেবার অসুবিধে থাকলে কিংবা না দিতে চাইলে মারধোর করার নিয়ম ছিল না। প্রথম যে ছেলে দুটো মারল, তারা আবহাওয়া বদলে দিল। ঐ ছেলে দুটো আসলে গুণ্ডা ছিনতাইবাজ, ওরা চাঁদা আদায়কারীর ছদ্মবেশ ধরল কেন? সরাসরি ছুরি দেখিয়ে কেড়ে নিলেই পারত। রাবণের মতন আর-একটা অন্যায় করল বলে ওরা সমস্ত চাঁদা আদায়কারীদের ওপর কলঙ্ক দিয়ে গেল। এখন কেউ চাঁদা চাইতে এলেই লোকে

সন্দেহ করে, দিতে চায়না। আর ওরাও দেখেছে, জোর করা কিংবা ভয় দেখানোই সহজ পথ—ফলে সম্পর্কটা এত বিশ্রী হয়ে গেল।

সেজোমাসি হন্তদন্ত হয়ে এসে চোখ গোলগোল করে বললেন, জানিস, সেই মেয়েটাকে আজ আবার দেখলাম ল্যানসডাউন রোডের মোড়ে—

জিজ্ঞেস করলাম, কোন মেয়েটা?

সেই যে সেদিন এসে কাঁদছিল! কী পাজী! কী পাজী! আজও ঠিক সেই একরকম—

মাস দু-এক আগে মেয়েটি আমাদের বাড়ির দরজার কাছে বসে কাঁদছিল। বছর পঁচিশেক বয়েস চেহারা, দেখলে মোটামুটি ভদ্র পরিবারেরই মনে হয়। শুধু কেঁদেই চলেছে, জিজ্ঞেস করলে কিছুই বলতে চায়না। আমার সেজোমাসি যেমন রাগী তেমনি দয়ালু। কথায়-কথায় লোকের ওপর রেগে ওঠেন—আমার ওপর তো অনবরতই রেগে আছেন। আবার লোকের দুঃখ-কষ্ট শুনলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন—মনটা এত নরম। সেজোমাসি প্রথমে রাগ করে বলছিলেন, এই, তুমি এখানে বসে কাঁদছ কেন? কাঁদবার আর জায়গা পাওনি?

মেয়েটি আস্তে-আস্তে তার দুঃখের কথা বলল। কাল রাত্তিরে তার বাবা মারা গেছেন। মায়ের খুব অসুখ। তিনটে ছোটো-ছোটো ভাইবোন! পাড়ার ছেলেরা তার বাবার মৃতদেহ দাহ করার জন্য উদ্যোগ করছে, কিন্তু ওদের বাড়িতে একটাও টাকা নেই। পাটনায় কাকা থাকেন, তাঁকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে, তিনি যদি টাকা পাঠান কিংবা আসেন...ভদ্র পরিবারের মেয়ে। কারুর কাছে টাকা চাইতেও পারছেনা। তার কানের দুলদুটো বাঁধা রেখে যদি গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিই!

মেয়েটিকে দেখে সন্দেহ করার কোন উপায় নেই। তাছাড়া আমাদেরও তো মাসের শেষে প্রায়ই কোন টাকা থাকেনা, একটাকা-দুটাকা দিয়ে কাজ চালাতে হয়। তখন যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে? ধার যাক, মাসের শেষ রবিবারের সকালে? তাহলে তো আমাদেরও টাকার জন্য—

টাকার জন্য দুল বাঁধা নেবার কোন প্রশ্নই ওঠেনা, সেজোমাসিরই তখুনি চোখ ছলছল করতে শুরু করেছে। ঝড়াক করে দিয়ে দিলে পঞ্চাশ টাকা। বললেন, *আরও যদি কিছু দরকার হয়, কাল এসো—*

কাল আর আসেনি, কোনদিন আসেনি। দুমাস বাদে মেয়েটিকে সেই একই গল্প বলতে শুনেছেন আর-একটা বাড়িতে—সেই কাল বাবা মারা গেছে, পাটনায় কাকাকে টেলিগ্রাম, কানের দুল বাঁধা দেওয়া। সেজোমাসি রেগে আগুন। *ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গিয়ে সেজোমাসি না অজ্ঞান হয়ে যান!*

মেয়েটি রাবণের মতন ওরকম ভুল করল কেন? এরপর সত্যিই যদি

আর-কারুর বাবা মারা যাবার পর হঠাৎ বিপদে পড়ে সাহায্য চায়...তখন তার সত্যিকারের দুঃখের মুহূর্তেও তো লোকে তাকে রেগে তাড়া করে যাবে। কেউ বিশ্বাস করবেনা। ঐ মেয়েটির বাবা দুমাস ধরে প্রত্যেকদিন মারা যেতে পারেনা, টেলিগ্রাম পৌঁছুতে যতই দেরি হোক, দুমাস লাগেনা—তবুও মেয়েটির সত্যি-সত্যি সংসারে অভাব আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ভিক্ষে করার তো অনেক পথ আছে। ঐরকম মিথ্যে গল্প বলায় ফল হল এই, সত্যিই যে ভিক্ষুক নয়, অথচ হঠাৎ বিপদে পড়েছে—সেও আর সাহায্য পাবেনা।

ছদ্মবেশ ধরার আগে এগুলো ভেবে দেখা নিশ্চয়ই উচিত। রাবণেরও উচিত ছিল।

১১

এলা নাম্নী কোন মেয়েকে আমি চিনিনা। কখনো এই নামের কোন জীবিত মেয়ের কথাও শুনিনি। কিন্তু প্রত্যেকটা নামের সঙ্গেই কল্পনার একটি মুখ থাকে। সুতরাং এলা যদি কোন মেয়ের নাম হয়, তবে তার মুখখানি কেমন দেখতে হবে—সে সম্পর্কে আমার কল্পনায় একটি স্পষ্ট ছবি ছিল।

শ্যামলী নামের যত মেয়ের সঙ্গেই আমার দেখা হোক—ঐ নাম শুনলেই আমার ছোটো পিসিমার কথা মনে পড়ে। সাধারণত একটু কালো মেয়েদেরই নাম রাখা হয় শ্যামলী—কিন্তু আমার শ্যামলী পিসিমা ছিলেন ধপধপে ফর্শা। বড় বেশি ফর্শা। একটু লম্বাটে, ডিম ছাঁদের মুখ, নাকে একটা মুক্তোর নাকছাবি—কথায়-কথায় লুটোপুটি হতেন। শ্যামলী পিসিমা মারা গেছেন অনেকদিন আগে, কিন্তু এখনও কোন সপ্রতিভ, আধুনিকা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলে যদি শুনি তার নাম শ্যামলী, তবুও আমার সেই হাস্যমুখী ফর্শা পিসিমার মুখখানাই প্রথমে মনে পড়ে। অল্পক্ষণের জন্যই যদিও পরক্ষণে সেই মুখ ভুলে সম্মুখবর্তিনীর প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ি। মৃতদের বেশি মনে রাখতে নেই।

এমনকী ইন্দিরা নামটি শুনলেও আমার ইন্দিরা গান্ধীর মুখ মনে পড়েনা। ভবানীপুরে থাকার সময় আমাদের পাশের বাড়িতে একটি ইন্দিরা নামের মেয়ে থাকত—তেরো-চোদ্দবছর বয়েস, খানিকটা কালোর দিকে—বৃষ্টিভেজা মাটির মতন গায়ের রং, ঢলঢলে চোখদুটি একটু বোকা-বোকা—কিন্তু গলার আওয়াজটা ছিল শুভলক্ষ্মীর চেয়েও সুরেলা। ইন্দিরাও বেঁচে নেই, টাইফয়েডে হঠাৎ মারা গিয়েছিল। এখনকার মেয়েদের মধ্যে ইন্দিরা নামটা শোনা যায়না তেমন, তবু,

কোথাও টাইফয়েড অসুখটার কথা শুনলেই ইন্দিরার মুখটা মনে পড়ে একপলক। মৃতদের মুখচ্ছবি স্মৃতিতে সহজে মরেনা।

একটা পার্টিতে একটি মেয়ের অপূর্ব নাম শুনেছিলাম। খুব কায়দার পার্টি, বিলিতি বাজনার সঙ্গে নাচেরও ব্যবস্থা ছিল, ছিল চার প্রকার পশুপাখির মাংস, ছিল তিন প্রকার লঘু ও কড়া মদ। আমার যে-কোন আনন্দ উৎসবই ভালো লাগে, দিশি-বিলিতি যে-কোন সঙ্গীত-নৃত্যই ভালো লাগে, মদ-মাংস সম্পর্কে তো কথাই নেই। শুধু ভালো লাগছিলনা, উপস্থিত কিছু ছেলেমেয়েদের। আজকাল একদল বোকা ছেলেমেয়ে তৈরি হয়েছে, বাঙালি হয়েও যারা নিজেদের মধ্যে পিজিন ইংরেজিতে কথা বলতে ভালোবাসে—পার্টিতে সেইরকম বোকা ছেলেমেয়ের দলই ছিল বেশি। তাদেরই মধ্যে একটি মেয়ে, শাড়ি পরেছে স্কার্টের ধরনে আঁটভাবে পেঁচিয়ে, শিঙ্গল করা চুল, মুখখানা ঝকঝকেভাবে মাজা, নিশ্চিত লরেটো হাউস বা কোন মিশনারি কলেজে পড়া মেয়ে, মুখ দিয়ে ধাতব ইংরেজির খই ফুটছে। মেয়েটিকে দেখতে ভালো, অর্থাৎ তার শরীরখানি সমানুপাতিক—সুতরাং তার সাজসজ্জা যাই হোক—তাতে কিছু যায়-আসেনা—আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলাম একদৃষ্টে। মিশনারি স্কুল-কলেজে পড়া ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে একটা উদ্ভট ব্যাপার আমার মনে পড়ছিল। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা—যে-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায়—যারা নিজের দেশ-সংসার-প্রতিষ্ঠা ছেড়ে এসে এদেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছে—তাদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েও এইসব ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগই এমন উৎকট রকমের বোকা আর চালিয়াৎ হয় কী করে? কী এর সামাজিক ব্যাখ্যা? হঠাৎ আমার ইচ্ছে হল ও মেয়েটির নাম জানতে হবে। নাম না-জানলে কোন মেয়ের ছবি সম্পূর্ণ হয়না। ভিড় ঠেলে আমি আস্তে-আস্তে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালে আলাপ হবেই। হলও তাই, আর-একটি ছেলে আমার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিল। মেয়েটির নাম শুনে আমি চমকে উঠলাম। কিছুই বুঝতে পারলামনা। মেয়েটির নাম জাটাবেডা। জাটাবেডা বটআচারিয়া।

এ আবার কী অদ্ভুত নাম? মেয়েটি স্পষ্টতই বাঙালি, ঠোঁটের ভঙ্গি দেখলেই বাঙালি চেনা যায়—যতই ইংরেজি কায়দা দেখাক। একবার মনে হল, মেয়েটির মা বাঙালি, বাবা হয়তো অন্যদেশের অন্যজাতের লোক। কিন্তু কোন্ জাতের মেয়েদের এমন বিদঘুটে নাম হয়? আমার অস্বস্তি কাটলনা। একফাঁকে মেয়েটিকে একটু একলা পেয়ে আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, মুখের ভাব বেশ কঠোর করে—আপনি-টাপনি নয়, সরাসরি তুমি সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার

নামটা কী? ঠিক বুঝতে পারিনি তখন।

মেয়েটি চমকে আমার দিকে তাকাল, এক অনুপল আমার চোখে চোখ রাখল, কী জানি ভয় পেল কিনা—কিন্তু শরীরের সজাগ ভঙ্গি সাবলীল করে পরিষ্কার কৃষ্ণনগরের ভাষায় বলল, আমার নামে জাতবেদা ভট্টাচার্য। আমার দাদামশাই এই নাম রেখেছিলেন—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, জাতবেদা মানে কী?

মেয়েটি এবার রহস্যময়ীর মতন হেসে বলল, আপনি বলুন-না? আপনি জানেননা? খুব আনয়ুজুয়াল নেম, তাই না?

আমি ভুরু কুঁচকোলাম। সত্যিই জাতবেদা কথাটার মানে আমি জানিনা, আগে কখনো শুনিনি। আন্দাজে মানে তৈরি করা যায়। সংস্কৃত শব্দ, মাঝখানে বা শেষে বোধহয় একটা বিসর্গ থাকার কথা। যে বেদ নিয়ে জন্মেছে? জন্ম থেকেই যে জ্ঞানী? এইরকমই কিছু একটা হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দাদামশাই এই নাম রেখেছিলেন?

মেয়েটি আবার ইংরেজিতে ফিরে গেছে। বলল, ইয়েস, দ্যাটস হোয়াট মাই মাদার টোল্ড মী। আই হার্ডলি রিমেম্বার হিজ ফেস দো—

হঠাৎ আমার হাসি পেল। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য! ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে, ভট্টাচার্য মানে—পূজারী, পুরোহিতের বংশ হওয়াও বিচিত্র নয়, দাদামশাই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ও ঐতিহ্যবাদী। তারপর পৃথিবীতে কত ওলোপালোট হয়ে গেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কত সংসারের ভাগ্য বদলে দিয়েছে, পুরুত বংশের মেয়ে এখন প্রাণপণে মেম হবার চেষ্টা করছে—কিন্তু দায় হয়েছে দাদামশাইয়ের চাপিয়ে দেওয়া ঐ নামটা। এমনই নাম যে, সংক্ষেপে জাটা কিংবা বেডা করলেও শ্রুতিমধুর হয়না। আহা-বেচারা! এফিডেবিট করে নামটা বদলে নিতে পারেনা? এই তো কিছুদিন আগে রত্নাকর নামে এক ভদ্রলোক এফিডেফিট করে বাল্মীকি হয়ে গেলেন।

সেই থেকে কোন অদ্ভুত উদ্ভট বিষম উল্টোপাল্টা ব্যাপার দেখলেই আমার ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়ে। বিহারের একটি গ্রাম্য রাস্তায় একটি গামছা-পরা লোকের হাতে হাতঘড়ি দেখেও আমার জাতবেদার কথা মনে পড়েছিল।

কিন্তু এলার কথা আলাদা। এলা নাম্নী কোন মেয়েকে আমি এপর্যন্ত দেখিনি, তবু ঐ নামের মুখখানি আমার কল্পনায় স্পষ্ট আঁকা আছে। একদিন সেই মুখ আমি বাস্তবে দেখতে পেলাম। দেখে আকস্মিক খুশির ছোঁয়ায় অভিভূত হবার বদলে অকারণ ভয়ে আমার বুক দুরদুর করছিল।

অনেকদিন বাদে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে দুপুরবেলা আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম। এমনসময় পাশের টেবিলে এলা এসে বসল। এলা

তার সত্যিকারের নাম কিনা জানিনা—কিন্তু অবিকল আমার কল্পনায় রাখা সেই মুখ। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' এককালে আমার অত্যন্ত প্রিয় বই ছিল, সেই চার অধ্যায়ের নায়িকা এলা, সেই কোমল তেজস্বিনী প্রণয়িনী, অন্ত অর্থাৎ অতীন যাকে দেখে বলেছিল।

'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস
তোমার চোখে দেখেছিলেম
আমার সর্বনাশ।'

এই সেই এলা, আজ সশরীরে, দুপুরবেলা কফিহাউসে। চায়ের দোকানে এলার হঠাৎ চলে আসার বর্ণনা আছে চার অধ্যায় উপন্যাসে। কিন্তু এ যে বাস্তব কফিহাউস। একটা অজানা ভয়ে আমার বুক দুরদুর করতে লাগল।

একটা টেবিলে একজন যুবক একা বসেছিল, আর দুটি মেয়ের সঙ্গে সেই এলা এসে বসল সেই টেবিলে। আমার ঠিক সামনে। কল্পনায় যেরকম ছিল, অবিকল সেই রূপ। অন্য মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা, রোগাও নয় স্থূলও নয়, ধপধপে ফর্শা রং, শাদা রঙের শাড়ি, কোথাও প্রসাধনের কোন চিহ্ন নেই—কিন্তু একটা চিক্কণ শ্রী ছড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। ধারালো নাক, ধারালো চোখ—তবু মুখে কোন কঠোরতা নেই। পাতলা ঠোঁট দুখানি, সুষ্ঠু চিবুক। টেবিলের ওপর হাত রেখে তার ওপর চিবুক, হাসিমুখে কথা বলবে। ঠিক তাই।

ভূত দেখলে যেরকম ভয় করে, কল্পনার মূর্তিকে বাস্তবে দেখলে সেইরকম ভয় হয়। ভয়-ভয় চোখে মেয়েটির দিকে আমি চেয়ে রইলাম। দুরন্ত ইচ্ছে হল, উঠে গিয়ে ঐ টেবিলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, আপনার নাম কি এলা? যদি না-ও হয়, তবু আপনি এলা—আপনি আমাদের টেবিলে এসে একটু বসুন! কিন্তু পরক্ষণে মনে হল, একথা বলার কী অধিকার আছে আমার! আমি তো অন্ত নই! আমি একটা এলেবেলে লোক। আমি আগে থেকেই ওর ঐ রূপ কল্পনা করে রেখেছিলাম, তাতে ওর কী যায় আসে। বিশ্বাসই বা করবে কেন?

বন্ধুদের সঙ্গে কথা আর জমছেনা, অন্যমনস্কভাবে হুঁ-হাঁ করে আমি ঘনঘন চেয়ে দেখছি মেয়েটিকে। ক্রমশ আমার ভয় বেড়ে যাচ্ছে। ভয়ে প্রায় কাঁপছি তখন। আমি এত ভয় পাচ্ছি কেন? বারবার নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তরটা খুঁজে পেলাম। যদি আমার কল্পনার ছবিটা হঠাৎ-রূঢ়ভাবে ভেঙে যায়—সেই ভয়। যদি দেখি মেয়েটি গোপনে নাক খুঁটছে কিংবা ওর হাসির আওয়াজ বিশ্রী কিংবা ঐ

ছেলেটির সঙ্গে ও কোন বদ রসিকতা করে তাহলে আমি জীবনে চরম আঘাত পাব! বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যদি আমার চোখে পড়ে ওর ঘাড়ে ময়লা কিংবা কনুই-এর কাছে শুকনো চামড়া—তাও আমি সহ্য করতে পারবনা। ঐটুকু ত্রুটিও আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

অকস্মাৎ আমি উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের বললাম, চলি রে! সঙ্গে-সঙ্গেই—মেয়েটির দিকে আর একবারও না তাকিয়ে—কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার কল্পনায় এলা চির রূপসী থাক। তাকে আমি নষ্ট হতে দিতে পারিনা!

১২

ছেলেবেলায় মা বলতেন, অচেনা জলে কখনও স্নান করিসনি। জলের আবার চেনা-অচেনা কী, সব জলই তো সমান। আসলে, মা হয়তো বলতেন, অচেনা পুকুরে। পুকুর বা পুষ্করিণী কথাটা কী যে-জায়গার মধ্যে জল থাকে সীমাবদ্ধ আয়তনের নাম, না সেই জলটুকুরই নাম, আমি ঠিক জানিনা। তবে, কোন অচেনা জায়গায় গিয়ে পুকুরে স্নান করতে, কোন রোগের ভয়ে নয়, বা সাঁতার জ্ঞানের অভাবে নয়—আমি পূর্ববাংলার নদীনালার দেশ থেকে প্রায় সাঁতারে এসেছি কলকাতা—সুতরাং ডুবে মরার ভয় নেই, কিন্তু তবু যে-কোন অজানা পুকুরে স্নান করতে, বিশেষত যদি আকারে একটু বড়ো এবং জলের রং কালো হয়, আমার ভয়-ভয় করে। মনে হয় পুকুরের ঠিক মাঝখানে কোন অজ্ঞাত চরিত্রের অতিকায় প্রাণী লুকিয়ে আছে। সেই জন্তুর চেহারাটা কল্পনা করতে পারিনা বলেই ভয়ে আরও গা ছমছম করে। জানা শত্রুর চেয়ে অজানা শত্রু হাজারগুণ ভয়াবহ।

কোন মানুষকে একবার অপয়া বলে ঘোষণা করলে যেমন আর সে অপবাদ কখনও ঘোচেনা, যে-কোন অঘটনের জন্য কোন-না-কোন সূত্রে সেই লোকটি দায়ী হয়ে যায়, সেইরকম পুকুর সম্বন্ধেও একবার 'রাক্ষুসে' বা 'সর্বনেশে' নাম রটে গেলে, সে কলঙ্ক আর মুছে ফেলার কোন উপায় নেই। এমন কোন দিঘি বা পুষ্করিণী নেই, যেখানে দু-একটা মানুষ বা বাচ্চা ডুবে মরেনি, মানুষ তো কতরকমভাবেই মরে, পুকুরে ডুবে মরার মধ্যে এমন আশ্চর্য কী আছে, তবু পাড়ার কোন প্রাজ্ঞ পিসিমা যদি উচ্চারণ করে ফেলেন 'ও পুকুরটা রাক্কুসে, প্রত্যেক বছর একটা করে মানুষ নেয়—' তাহলে তৎক্ষণাৎ সে কথা রটে যাবে, এবং স্থান পেয়ে যাবে ইতিহাসে। উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কের পুকুর সম্পর্কে আমরা

ছেলেবেলায় গুজব শুনেছি, ওর মধ্যে কী একটা অদ্ভুত প্রাণী আছে, যা প্রতিবছর দুটো করে বাচ্চা ছেলে খায়। একবার নাকি কুড়ি হাত লম্বা একটা বিকট জন্তু জল থেকে উঠে এসে লোকজনকে তাড়া করে আবার জলে নেমে যায়। অবশ্য, সে-জন্তু আমরা দেখিনি, দেখেছে এমন লোকের সঙ্গেও দেখা হয়নি, কিন্তু প্রতি বছর এখনও দুটো করে ছেলে মরছে ঠিকই।

যাইহোক, আমাদের আগের বাড়িতে একটা বেশ বড়ো পুকুর ছিল। অবশ্য পুকুরটা ঠিক বাড়িতে নয়, এবং বাড়িটাও আমাদের নয়। করপোরেশনের এলাকা একটু ছাড়িয়ে, কোন ধনী জমিদারের একদা যে প্রমোদ-বাগানবাড়ি ছিল, এখন দৈন্যদশায় সেটাতে অনেকগুলি ফ্ল্যাট বানানো, তারই একটাতে আমরা ছিলাম। বাড়ির পাশে একটা শ্রীহীন বাগান, সেখানে দু-একটা দুর্লভজাতীয় ফুলগাছের সঙ্গে অজস্র আগাছার ঝোপ, তার ওপাশে পুকুর—একদা চারদিক পাঁচিল ঘেরা ছিল নিশ্চিত, এখন দূরের রাস্তার গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে বলদজোড়াকে এ-পুকুর থেকে জল খাইয়ে নিয়ে যায়।

সারা গ্রীষ্মকালটা ওখানে স্নান করতাম। জল বেশ হাল্কা ও ঠাণ্ডা, তাছাড়া শ্যাওলা ছিলনা, একবার সাঁতার কেটে এপার-ওপার হয়ে এলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যেত।

সেই পুকুরটা সম্পর্কে হঠাৎ একবার অপয়া বা সর্বনেশে বদনাম রটে গেল। একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে পুকুরের মাঝখান থেকে একডুবে মাটি তুলতে গিয়েছিল। যখন ভেসে উঠল, হাতে মাটি নেই, কিন্তু কপাল ও নাক জুড়ে অনেকখানি কাটা, ছেলেটা কোনমতে পাড়ে সাঁতরে এসে অতখানি রক্তক্ষরণের পর অবশ হয়ে পড়ল। নিশ্চয়ই কোন ইটের টুকরো বা গজাল বা পাথরে লেগে—কিন্তু লোকে অন্যরকম সন্দেহ করল। বিশেষত, ত্রিলোচনবাবু, যিনি প্রত্যেকদিন ঐ পুকুরের একগলা জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গাস্নানের স্তব পড়তেন, ঈষৎ গম্ভীরভাবে বললেন, এ-পুকুরটায় দোষ আছে হে। আমি অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি! কুমীর বা কচ্ছপ না—ওরা লুকোতে পারেনা, জানান দেয়ই। ওসব আগেকার দিনের জমিদারদের ব্যাপার—কত লোককে মেরে হয়তো পুঁতে রেখেছিল এই পুকুরেই। নইলে, সেদিন একটা মরা শালিক ভাসছিল কেন? পুকুরে কেউ কখনও মরা পাখি দেখেছে এর আগে?

ত্রিলোচনবাবুর বলার ভঙ্গি এমন, যে, শুনলেই বিশ্বাস করতে মন চায়। বিশেষত শেষের কথাটা। সত্যিই কয়েকদিন আগে পুকুরে একটা মরা শালিক ভাসছিল। কীরকম যেন শুকনো ধরনের মরা, শরীরে কোন আঘাত নেই, অর্থাৎ কেউ উড়ন্ত পাখিটাকে মারেনি। তাহলে কি আপনিই মরে পড়েছিল? আজ পর্যন্ত,

কোন স্বাভাবিকভাবে মৃত পাখি আমি দেখিনি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই গল্প 'চড়ুই পাখিরা কোথায় যায়?' বহুবার ভেবেছি। বাড়িতে কত চড়ুই পাখি, ঘুলঘুলিতে বাসা বাঁধে, অথচ একটা মরা চড়ুই, স্বাভাবিকভাবে হার্ট ফেল করে বার্ধক্যে মরা, কোনদিন বাড়িতে দেখিনি। মরার আগে সব পাখিরাই কোন এক অনির্দিষ্ট দেশে চলে যায় মরতে।

এরপর ঐ পুকুরে স্নানার্থীদের সংখ্যা যত কমতে লাগল, তত বাড়তে লাগল গুজব। কে নাকি, দুপুরে একলা ঘাটে গিয়ে দেখেছে জলের মাঝখান থেকে অসংখ্য বুড়বুড়ি উঠছে। আরেকজন সত্যিই দেখেছে একটা কোন বিশাল প্রাণী জলের মধ্যে থেকে দাপাদাপি করছে। অসম সাহসিনী মাদ্রাজী বউ এসব শোনা সত্ত্বেও হাসতে-হাসতে সাঁতরে পুকুর পার হতে গিয়ে পায়ে ক্র্যাম্প ধরে—এবং তার ধারণা কেউ তার পা টেনে ধরেছিল।

আমাদের নিচের ফ্ল্যাটে থাকত তপন, পোর্ট কমিশনে কাজ করে, ক্রিকেট খেলা চেহারা, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও মুর্গীর মাংস রান্না ওর জীবনের এই দুটিমাত্র নেশা, একদিন আমাকে ডেকে বলল, কী আপনি যে আর পুকুরে স্নান করতে আসেননা, আপনিও ভয় পেলেন নাকি? স্বীকার করতে লজ্জা হল, তবু সত্যিই আমি ভয় পেয়েছিলাম। পুকুরটা আমার কাছে আবার কী রকম অচেনা হয়ে গেছে। পুরোনো কালো জল, সারাদিন আজকাল আর স্নানার্থীদের দাপাদাপি থাকে না বলে শান্ত ও গম্ভীর, দেখলেই আমার কীরকম রহস্যময় যেন মনে হয়। আমাদের বারান্দা থেকে দূরে পুকুরটা একটু-একটু দেখা যায়। একদিন পড়ন্ত বিকেলে সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম। কিছুই দেখিনি, তবু চমকে উঠেছিলাম। কিছু একটা দেখব এই প্রত্যাশা, অথবা অযৌক্তিক অলৌকিকের প্রতি আমার গোপন বিশ্বাস জন্মানোর লজ্জাতেই চমকে উঠেছিলাম হয়তো।

কাধে তোয়ালে, ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে-মাজতে তপন আমাকে বলল, আসুন, নেমে আসুন।

আমি বললাম, না, এখন বর্ষা নেমে গেছে, ঐজন্যই আর পুকুরে যেতে ইচ্ছে হয় না আর কী।

যাঃ, এ আর কী এমন বর্ষা। আসুন, নেমে আসুন। আমি তো রয়েছি, ভয় কী!

শেষের কথাটাই আমার আত্মাভিমানে আঘাত দিল। যেতে হল। পুকুরে যাবার পথে তপন সদ্যদেখা কী যেন একটা সিনেমার গল্প বলতে লাগল আমায়, জলে নেমেও সেই গল্প, কখন যে আমরা পুকুরটাকে ভুলে থেকে স্নান সেরে

উঠে এলাম খেয়ালই নেই। এইরকম পরপর তিনদিন গেলাম, নির্দোষ, সরল জল, কোথাও কোন রহস্য নেই, আমরা দুজন যুবক স্নান সেরে আসি। যদিও আমরা দুজনেই হয়তো মনে-মনে লজ্জিত হয়ে ছিলাম একটা ব্যাপারে, আগে একবার অন্তত পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে আসতাম, এখন মাঝখান পর্যন্তও যাইনা।

এরপর কয়েকদিন যাইনি, তিনদিন প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি, স্নান না-করে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে খিচুড়ি খাবার দিন। হঠাৎ শুনতে পেলাম, ছদিন ধরে তপন বাড়ি নেই। বাড়ির লোক কিছুই জানেনা কোথায় গেছে। মেঘ সরে গিয়ে চতুর্থ দিনের রোদে আমরা তপনের জন্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। এরকম না বলে-কয়ে সে তো কোথাও যাবেনা। ত্রিলোচনবাবু বললেন, পুলিশে খবর দাও হে, আর পুকুরে জাল ফেলো!

পুলিশে খবর দেওয়া হল, কিন্তু পুকুরে জাল ফেলতে হলনা। তার আগেই তপনের মৃতদেহ ভেসে উঠল। জলে ফুলে বীভৎস চেহারা। সেই প্রথম আমি মৃতদেহ দেখলাম, যাকে আমি জীবন্ত অবস্থায় চিনতাম। আমাদের পরিবারে তখনও কোন মৃত্যু আসেনি। পুলিশ খুব পুলিশী কায়দায় জিজ্ঞেসবাদ করতে লাগল সকলকে, প্রথমেই ত্রিলোচনবাবুকে, আমরা সবাই বিষম অস্বস্তিতে রইলাম! এ কী ধরনের মৃত্যু তপনের, যাতে ওর সম্পর্কে শোক করার বদলে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধেই উদবিগ্ন হতে হচ্ছে। অবশ্য, বেশিক্ষণ এরকম রইল না, তপনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সকালে, বিকালের দিকে তপনের বউদি বুকশেলফের পিছন থেকে চিঠিটা খুঁজে পেলেন। চিঠিটায় তিনদিন আগের তারিখ দেওয়া, বোধহয় ঝড়ে উড়ে পড়ে গিয়েছিল টেবিল থেকে। সেই মামুলি এবং অতি প্রয়োজনীয় চিঠি, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়...'। আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ তপনের সম্বন্ধে সত্যিকারের দুঃখিত হতে শুরু করলাম। যদিও তপনের রুচির প্রশংসা করতে পারিনি আমি, মরতে হলে কত ভদ্র উপায় আছে, ঘুমের ওষুধ, তার বদলে অমন বিশ্রীভাবে ডুবে মরা। তাছাড়া ডুবলই বা কী করে, অমন ভালো সাঁতার জানত!

যাইহোক, এরপর পুকুরটা সম্বন্ধে বদনাম কেটে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ ওর মৃত্যুর জন্য জলের কোন দোষ নেই। তাছাড়া, জলের মধ্যের অদেখা জন্তু তো আর ওকে দিয়ে চিঠি লেখায়নি! কিন্তু পুকুরটা হয়ে গেল সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। কেউ আর ওর ধারও মাড়ায়না, সাঁতার জানা সত্ত্বেও তপন ডুবে মরল কী করে, এ-রহস্যই সকলকে ভয় দেখায়।

অথচ, খুব সহজ। হয় তপন গলায় ভারী কিছু বেঁধে নিয়েছিল, তিনদিন

পর সেটা ছিঁড়ে যেতে মৃতদেহ ভেসে ওঠে। অথবা...অথবা, আর-একটা কথা আমার বারবার মনে হতে লাগল, হয়তো তপন ঝোঁকের মাথায় পুকুরের মাঝখানে ডুব দিয়ে দেখতে গিয়েছিল—কেন সেই ছেলেটার নাক ও কপাল কেটেছিল—তারপর মনে ভয় থাকার জন্যই হয়তো দম আটকে যায়, কিংবা কিছুতে জামা-কাপড় জড়িয়ে...কী জানি। আমার এই দ্বিতীয় সন্দেহটার কথা দু-একজনকে বলতেই তারা তৎক্ষণাৎ মেনে নিল এবং এটাই মুখে-মুখে ছড়িয়ে গেল যে, পুকুরের মাঝখানে একটা ভয়ংকর কিছু আছে—তপন সেটাই ডুব দিয়ে দেখতে গিয়ে মারা যায়। উল্টে আমিই তখন প্রতিবাদ করে বলি, তাহলে তপন চিঠি লিখল কেন? কেউ সে কথা শোনেনা। পুকুরটা সম্পর্কে চরম দুর্নাম ছড়াবার জন্য দায়ী হলাম আমিই।

তপনের মৃত্যু আমাকে সাহসী করে দিয়েছিল। পুকুরটা সম্বন্ধে সব কুসংস্কারই তখন অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি। অতদিনের পুকুর—ওর মধ্যে আবার জন্তুজানোয়ার কী থাকবে? থাকলে কেউ-না-কেউ দেখতই। বড়জোর মাঝখানে কোন বাঁশ বা পাথরের টুকরো পোঁতা আছে। আমার ইচ্ছে হত এক-একবার, আমিও খুব খারাপ সাঁতার জানিনা, সাবধানে একবার ওখানে ডুব দিয়ে দেখে আসি, ওখানে কী আছে, তারপর লোকের ভুল ভেঙে দি।

তার বদলে আমরা ও-বাড়ি ছেড়ে দিলাম। আমিই উদ্যোগী হয়ে খুব তাড়াতাড়ি খোঁজাখুঁজি করে, অমন খোলামেলা বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম আবার করপোরেশন এলাকার মধ্যে। বাড়ির লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল আমার ব্যস্ততা দেখে, কিন্তু আমি সত্যিই ওখানে থাকতে চাইনি আর। জলের রহস্য জানতে আমার আর ইচ্ছে হয়না। এখন করপোরেশনের কলের ছিরছিরে জলই আমার ভালো লাগে।

ও-বাড়িতে শেষ ক'দিন আমার ইচ্ছে হতো পুকুরে স্নান করতে। মা দিতেননা কিছুতেই। অথচ, কুসংস্কার মেনে একটা নিরীহ পুকুরে স্নান না-করার কী মানে হয়। আমি মাঝে-মাঝে সন্ধেবেলা পুকুরপাড়ে যেতাম। বাঁধানো ঘাটের ওপর বসে সিগারেট ধরাতাম। পুকুরের যেখানটায় তপনের দেহটা ভেসে উঠেছিল সেদিকে তাকালে কীরকম বিশ্রী উদাসীন লাগত। হঠাৎ একদিন কান্নার শব্দ। দেখি ঘাটের পাশে মাঠের ঘাসে বসে একটি যুবতী মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তখন সন্ধের আবছা অন্ধকার। মেয়েটি বোধহয় আমাকে দেখতে পায়নি। আমি তৎক্ষণাৎ সে-জায়গা ছেড়ে উঠে এলাম, মেয়েটির মুখ দেখার চেষ্টাও না-করে।

নিছক ভদ্রতাবোধে চলে আসিনি। ভয়ে! ভয় হয়েছিল, মেয়েটিকে যদি কোন কারণে চিনতে পেরে যাই, যদি হঠাৎ মনে পড়ে তপনের মৃত্যুর সঙ্গে ওর কোন

সম্পর্ক—তা হলেই তো মহামুশকিল। পুকুরের জলের রহস্যের বদলে চোখের জলের রহস্য নিয়ে তখন আমাকে আবার মগ্ন হতে হবে। তাছাড়া মেয়েটি যদি বলে, আপনি বিশ্বাস করেন, পুকুরের মাঝখানে কী আছে—এটা জানার জন্যই শুধু তপন মরেছে? আপনি একবার ডুব দিয়ে দেখে আসুন না! সর্বনাশ, এই রহস্য কিংবা রহস্য উন্মোচন করতে আমাকে কতদূর জটিলতায় চলে যেতে হবে ভাবতেই আমার ভয় হয়েছিল।

তারপরই ও-বাড়ি থেকে চলে আসি। এখন জলের আর কোন চেনা-অচেনা নেই। কোন রহস্য নেই। কল দিয়ে কেঁচো বা সাপ বেরুলেও এখন আর নতুন বিস্ময়ের কিছু থাকবেনা। সরু জলের ধারায় আমার স্নান করার সময় পুরো শরীরটাও ভেজে না—কিন্তু তাতেও দুঃখ নেই তবু তো আমাকে কোন জলের রহস্য ভেদ করতে হবেনা।

১৩

মা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, কাল শান্তাদের বাড়িতে গিয়েছিলি?

আমি বই হাতে, অন্যমনস্ক, তবু সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই বুঝেছিলাম মা আসছেন আমার ঘরে এবং এসে এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করবেন। মা তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী বলল শান্তা?

বইয়ের সে-পাতার একেবারে শেষ লাইনে এসে চোখ থমকে আছে, সুতরাং সেই লাইনটা না-পড়ে উত্তর দেওয়া যায়না। শেষ করে, বইটা মুড়ে রেখে চোখ তুলে উত্তর দিলাম, শান্তামাসির সঙ্গে দেখাই হলনা। বড়ো মেসো আর শান্তামাসি টালিগঞ্জ গেছেন শুনলাম, বাড়িতে আর কেউই নেই। ছোটকু বাথরুমে ছিল, আর নবনীতাকে দেখলাম তার প্রাইভেট টিউটর পড়াচ্ছে—তখন ওর সঙ্গে কথা বলা যায়না। তাই আমি বেশিক্ষণ না-দাঁড়িয়ে চলে এলাম। আমার একটা কাজ ছিল।

—শান্তার শাশুড়ি ছিলনা?

—দেখলাম না তো!

—আজ তাহলে একবার যাস—

ততক্ষণে আমি আবার বইটা খুলেছি, পরের পাতার প্রথম লাইনে চোখ নিবদ্ধ, উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, দেখি যদি পারি তো একবার যাব আজ আবার—

—শান্তার টেলিফোনটা খারাপ—আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছিনা, তুই একটু জিজ্ঞেস করে আসিস আজ, ওর কী মত সেই বুঝে—

—যাব, যাব, বলছি তো সময় পেলে আজ যাব—

আজ যে যাব তা বহুক্ষণ আগে থেকেই আমি ঠিক করে রেখেছি, সিঁড়িতে মার পায়ের শব্দ পেয়েই—যত কাজই থাক আজ যাব। কেননা, কাল আমি সত্যিই যাইনি। ওটা মিথ্যে কথা। শান্তামাসির মেয়ে নবনীতার সঙ্গে আমাদের পাশের বাড়ির দেবনাথের বিয়ের সম্বন্ধ মা প্রায় ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। দেবনাথের বাবার চিনির কল আছে, দেবনাথ নিজেও জার্মানি থেকে ও ব্যাপারে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা তার। খুবই সুপাত্র যাকে বলে। এ-বিয়ে হলে শান্তামাসিও আনন্দে আটখানা হবে, আমারও আনন্দের কারণ আছে, স্যাকারিন দিয়ে চা খেয়ে-খেয়ে জিভ তেতো হয়ে গেল, এ-বিয়ে হলে নবনীতার শ্বশুরবাড়ি গেলে নিশ্চয়ই চিনি দেওয়া চা খাওয়া যাবে সবসময়। ও-বাড়িতে নিশ্চয়ই প্রত্যেকদিন প্রতিবারের চা-তেই চিনি থাকে।

সেদিন সন্ধেবেলা সব কাজ ফেলে শান্তামাসির বাড়িতে গেলাম। শান্তামাসি বাড়ি ছিলেন, সবাই বাড়ি ছিলেন, শান্তামাসি এই সম্বন্ধের কথা শুনে খুব খুশি —নবনীতাকে আমি বিয়ের কথা বলে রাগালাম। আমার আগের দিন না আসায় কোন ক্ষতি হয়নি, মায়ের কাছে আমার মিথ্যে কথা বলাটা ধরা পড়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। লাখ কথা না হলে বিয়ে হয়না, মা-মাসিতে এখন এত কথা হবে যে আগের দিন আমি গিয়েছিলাম কী যাইনি—সে প্রসঙ্গই উঠবেনা। কিন্তু আমার মিথ্যে কথায় একটু খুঁত রয়ে গেল।

শান্তামাসির বাড়িতে এর আগে গিয়েছিলাম মাস দুয়েক আগে, সেদিন ঘরভর্তি সবাই বসে গল্প করছিল, এমনসময় ঝি এসে নবনীতাকে বলল, দিদিমণি তোমার মাস্টারমশাই এসেছেন! আড্ডার মাঝপথে নবনীতাকে উঠে যেতে হল, শুনলাম পরীক্ষার আগের চারমাস ওকে ওদের কলেজের একজন অধ্যাপক বাড়িতে পড়াচ্ছেন—নবনীতা বরাবরই ইংরেজিতে একটু কাঁচা। সেদিন উঁকি মেরে দেখেছিলাম, আমারই বয়েসী অ্যাংরি ইয়ংম্যান টাইপের এক ছোকরা ওর সেই অধ্যাপক।

সুতরাং, মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলবার সময়, পরিবেশ ফোটাতে আমার বিশেষ অসুবিধে হয়নি। শান্তামাসির ভাসুরের ক্যান্সার হয়েছে, তাঁকে দেখতে প্রায়ই ওঁরা টালিগঞ্জে যান। সুতরাং শান্তামাসির টালিগঞ্জে যাওয়ার কথা শুনলে মা অবিশ্বাস করবেননা। ছোটকুর স্বভাব অফিস থেকে ফিরেই ঘণ্টাখানেক বাথরুমে কাটানো—দিনে তিন-চারবার চান করা ওর বাতিক। আর সন্ধেবেলা নবনীতার অধ্যাপক তো পড়াতে রোজই আসে। শান্তামাসির শাশুড়িও প্রায় রোজ বিকেলেই মহানির্বাণ মঠে কথকতা শুনতে যান। সুতরাং বইয়ের দিকে মনোযোগ দেবার

অছিলায় আমি চট করে মিথ্যে কথাটা বানিয়েছিলাম। তবু একটা খুঁত রয়ে গেল। পরের দিন শান্তামাসির বাড়িতে গিয়ে কথায়-কথায় জানতে পারা গেল, দিন পনেরো আগে নবনীতার সেই অধ্যাপককে নাকি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নবীন অধ্যাপকটি উগ্র আধুনিক এবং উদ্ধত, বাড়ির সবার সামনে সিগারেট খায়, এমনকী স্বয়ং শান্তামাসির বর অর্থাৎ আমার জবরদস্ত বড়োমেসোর কাছে সে নাকি দেশলাই চেয়েছে—এই অপরাধে তার চাকরি গেছে। শান্তামাসি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বুড়োসুড়ো ধীরস্থির আর-কোন অধ্যাপককে জোগাড় করে দিতে পারি কিনা।

মায়ের কাছে আমার মিথ্যে কথাটায় এই একটা খুঁত থেকে গেল—নবনীতা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ছে। তা যাকগে, আসল কাজটা তো ঠিকঠাকই হচ্ছে —সামান্য একটা মিথ্যে কথায় কী আসে যায়!

কিন্তু মায়ের কাছে ঐ মিথ্যে কথাটা আমি কেন বললাম? যদি বলতাম, না মা, কাল শান্তামাসিদের বাড়িতে যেতে পারিনি, আজ যাব—তাহলে কী এমন ক্ষতি হতো? মা দু-তিনদিন ধরেই যেতে বলছিলেন, আমি রোজই যাব-যাব করে পাশ কাটাচ্ছিলাম, সুতরাং তিনদিনের দিন ঐ মিথ্যে কথা এবং চতুর্থ দিনের দিন সত্যিই যাওয়া। কিন্তু তৃতীয় দিনেও ঐ মিথ্যেটা না বলাই তো আমার উচিত ছিল। তবু কেন?

—তারপর ইন্দ্রনাথ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

—তাই নাকি? তারপর?

—প্ল্যাটফর্মে বিশেষ লোকজন নেই, কয়েকটা ছোকরা একদিকে জটলা করছিল—তাদের চেহারাও বিশেষ সুবিধের নয়—ইন্দ্রনাথের ঐ অতবড়ো জোয়ান শরীর আমার পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়— মাথায় জল ছেটানো দরকার—অথচ ওকে ফেলে রেখে যেতে পারছিনা।

—কেন, তাতে কী হবে?

—ইন্দ্রনাথের পকেটে চার হাজার টাকা ছিল, ও আমাকে আগেই বলেছিল —সুতরাং ওকে একা ফেলে যাওয়া, আর সেই ছোকরাগুলোর রকমসকম...

—তখন কী করলি?

—ইন্দ্রনাথের ওপর চোখ রেখে একটু দূরে ঘোরাঘুরি করে অতিকষ্টে একটা কুলিকে দেখতে পেলাম, ছোটো স্টেশন তো...কুলিটাকে দিয়ে জল আনালাম এক বালতি...তারপর পৌনে দুঘন্টা বসে থাকার পর পরের ট্রেন যখন এল...

ইন্দ্রনাথ এবং আমার—দুজনের বন্ধু এমন একজনকে ঘটনাটা শোনাচ্ছিলাম। ঘটনাটি সবই সত্যি। ইন্দ্রনাথের একদিন সত্যিই খুব শরীর খারাপ হয়েছিল এবং

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল রাত্রিবেলার প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু বলার সময় কেন যে একটু বদলে গেল—কিছুই বুঝিনা। ইন্দ্রনাথ বলেছিল ওর পকেটে দেড় হাজার টাকা আছে। দেড় হাজার টাকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবু সেটাকে বাড়িয়ে চার হাজার টাকা বলার ইচ্ছে আমার কেন হল, আমি নিজেই জানিনা। পরের ট্রেন এসেছিল আধঘণ্টা বাদে—আমি সেটাকে বাড়িয়ে করলাম পৌনে দুঘণ্টা। কেন? এমনকী আধঘণ্টার বদলে একঘণ্টা কী দুঘণ্টাও নয়, পৌনে দুঘণ্টা। ঘটনাটাকে বেশি গুরত্ব দেবার জন্য এই মিথ্যের অবতারণা? পকেটে দেড় হাজার টাকা নিয়ে নির্জন প্ল্যাটফর্মে এক বন্ধুর অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাই তো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—তাকে আরও বাড়িয়ে আমার লাভ কী? তাহলে কী, সবসময় যা ঘটে—তারই পুনরুক্তি করতে একঘেয়ে লাগে বলেই এইসব নির্দোষ মিথ্যে বলতে সাধ হয়?

—রতনটা একেবারে বাজে ছেলে। কোন কথা দিয়ে কথা রাখেনা—বড়োবউদি বললেন।

—অফিসেও কেউ ওকে গ্রাহ্য করেনা শুনেছি। মুখেই শুধু লম্বাচওড়া কথা, কাজের বেলা কিছুনা—এবার ছোটোবউদি।

পারিবারিক মহলে আমার মামাতো ভাই রতনের খুব নিন্দে হচ্ছিল। আমার ঠিক সহ্য হচ্ছিলনা। রতনকে আমার খুব ভালো লাগে, চমৎকার দিলখোলা মানুষ, সরলভাবে হা-হা করে হাসে, কী চমৎকার গান গায়। রতনের দায়িত্বজ্ঞান একটু কম, সময়ের ঠিক রাখে না, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেনা—কিন্তু একই মানুষ ভালো গান গাইবে, আবার সময়েরও ঠিক রাখার আদর্শ দায়িত্বপালন হবে—এতটা আশা করা যায়না। রতনের আমি ভক্ত। সুতরাং আমি প্রাণপণে বউদিদের নিন্দের প্রতিবাদ করতে লাগলাম। কিন্তু বউদিরা ওসব গানটানের দিকেই যাচ্ছেনা। শুধু ঐ দায়িত্বজ্ঞানটার ওপরই সব জোর। তখন আমি বললাম, রতনের দায়িত্বজ্ঞান নেই কে বলল? গতবছর সেই যে আমরা পুরী গেলাম— রতনই তো আমাদের বাড়ি ঠিক করে দিল!

বড়োবউদি বললেন, রতন বাড়ি ঠিক কররে দিয়েছে? আমি বিশ্বাস করিনা। আমি বললাম, সত্যিই। রতনের কথাতেই তো আমরা দীঘা না গিয়ে পুরী গেলাম। রতন বাড়ি ঠিক করে দেবে বলেছিল—আমিও প্রথমটায় ঠিক বিশ্বাস করিনি—কিন্তু রতন ওর এক বন্ধুকে চিঠি লিখে রেখেছিল—স্বর্গদ্বারে চমৎকার বাড়ি—ভাড়া লাগলনা —এমনকী পৌঁছে দেখলাম আমাদের জন্য খাবারদাবার রেডি। রতনের অফিসের ম্যানেজারের বাড়ি—

—সত্যি বলছ?

রতনের নিন্দে থামাবার জন্য রতনের দায়িত্বজ্ঞানের এই কাহিনীটা বলার প্রেরণা আমার ভেতর থেকেই কে যেন আমায় দিয়ে দিল। ঘটনার কাঠামোটা তো সত্যিই। আমরা ঠিকই পুরী গিয়েছিলাম, রতন ছিল আমাদের সঙ্গে—ঠিক করেছিলাম কোন হোটেলে থাকব। কিন্তু স্টেশনেই রতনের অফিসের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হল—তিনি কলকাতায় ফিরছেন সপরিবারে। তিনিই উৎসাহিত হয়ে বললেন, স্বর্গদ্বারে একটা বাড়ি তিনি অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দুমাসের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে একমাসের পরই তিনি ফিরে যাচ্ছেন—সুতরাং সেই বাড়িতে আমরা অনায়াসে একমাস থাকতে পারি। বাকি অংশটা রং চড়ানো হলেও রতনের জন্যই তো আমরা বাড়িটা পেয়েছিলাম।

ছোটোবউদি বললেন, সত্যি, রতন পুরীতে বাড়ি জোগাড় করে দিতে পারে নাকি—আমার দাদা বউদি পুরী যাবেন বলেছিলেন—তা হলে রতনকে বলতে হবে তো!

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সর্বনাশ, এদিকটা তো আমি ভেবে দেখিনি! আজ বিকেলেই রতনের কাছে ছুটতে হবে। রতনের প্রশংসা করতে গিয়ে আমিই তার বিপদের কারণ ঘটালাম।

এইসব অকারণ মিথ্যে অকারণেই অনেকসময় ধরা পড়ে যায়। প্রথম ঘটনায় আবার ফিরে আসি। শান্তামাসির বাড়ির টেলিফোন আবার ঠিক হয়ে গেল, আমার আর দায়িত্ব রইল না কিছুই। নবনীতার বিয়ে আমার মায়ের উদ্যোগেই প্রায় ঠিকঠাক। এমন সময় একদিন মা ট্যাক্সিতে আসতে-আসতে দেখলেন, কলেজের রাস্তায় নবনীতা আরও দুটি মেয়ে এবং তিনটি ছেলের সঙ্গে খুব হাসিগল্প করছে। এতে মনে করার কিছু নেই—আজকালকার কলেজের মেয়েরা বাইরে ছেলেদের সঙ্গে মিশবে, গল্প করবে—এ তো স্বাভাবিক। মা বাড়ি ফিরে হাসতে-হাসতেই বললেন, নবনীকে রাস্তায় দেখলাম, খুব বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে, আমি আর ডাকিনি! তারপর মা শান্তামাসিকে ফোন করলেন—একথা সেকথা সাতকাহনের পর মা জিজ্ঞেস করলেন, নবনীতা বাড়ি ফিরেছে কিনা। ফিরেছে শুনে মা টেলিফোনেই ফিসফিসিয়ে বললেন, দ্যাখ শান্তা, নবনীকে যখন মাস্টার এসে পড়ায়—তখন তোরা সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাসনা! আজকালকার ছেলেমেয়ে—যতই ভালো হোক...নবনী অবশ্য সোনার টুকরো মেয়ে কিন্তু বলা তো যায় না—কখন কী বিপদ হয়ে যায়—খবরের কাগজে যা এক-একখানা মাঝে-মাঝে বেরোয়।

—শান্তামাসি অবাক হয়ে বললেন, নবনীকে তো এখন আর কেউ পড়ায়না।

—কেন, এই যে নীলু দেখে এল গত সোমবার?

—গত সোমবার? অসম্ভব!

—হ্যাঁ, নীলু নিজের চোখে দেখে এসেছে—সেই মাস্টার নবনীকে পড়াচ্ছে, তোরা তখন টালিগঞ্জে গিয়েছিলি—

তারপর কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আবার সেই দৃশ্য, আমি আমার ঘরে, হাতে বই, আমার সামনে রাশিয়া, আমেরিকার মতন দুই বিশাল শক্তি, মা আর মাসিমা। শান্তামাসি : নীলু, তুই নিজের চোখে দেখেছিলি? মা : তুই না দেখে থাকলে শুধু-শুধু কেন মিথ্যে কথা বললি? আমি আর কী উত্তর দেব? কোন যুক্তি নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই—আমি যে এমনিই বলেছিলাম—সেকথা তো ওঁদের বলা যায়না! সুতরাং বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে হাসতে-হাসতে বললাম, কী যে হয়েছে তোমরা, একটু ইয়ার্কিও বোঝনা।

১৪

বেচু রক্ষিত নামে একজন লোক কেষ্টনগর থেকে কলকাতায় আসছিলেন তাঁর ভগ্নিপতির বাড়িতে। ট্রেনে ওঠবার আগে চার টাকার সরপুরিয়া-সরভাজা কিনে নিয়েছেন দিদি-জামাইবাবুর জন্য। কলকাতায় তো আর দুধ-ক্ষীরের জিনিশপত্র পাওয়া যায়না, তাই কেষ্টনগরের নামকরা মিষ্টি নিয়ে চলেছেন ওদের খুশি করতে।

ব্যাপারটার শুরু এইখান থেকে। বেচু রক্ষিত মিষ্টির হাঁড়িটা বাঙ্কের ওপর সুটকেশ-বিছানার পাশে লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়েছেন। এক ঘুমে কলকাতা। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেই ধড়মড় করে উঠে প্রথমেই তিনি খোঁজ নিয়েছেন মিষ্টির হাঁড়ির। না, কেউ চুরি করেনি, কেউ খোলেওনি। কিন্তু হাঁড়িটার ওপর দুটো নীলরঙের ডুমো-ডুমো মাছি বসে আছে। ওরা সেই কেষ্টনগর থেকেই হাঁড়ির মধ্যে রসের খোঁজ পেয়ে হাঁড়ির গায়ে লেগে আছে। বিরক্ত হয়ে বেচু রক্ষিত হাতের ঝাপটায় মাছি দুটোকে তাড়িয়ে বললেন, যাঃ যাঃ! মাছিদুটো একটু ভন-ভন করে উড়ল আশেপাশে, তারপর হাতের ঝাপটার ভয়ে দূরে-দূরে রইল।

গাড়ি থেকে নেমে কাঁখালে সতরঞ্চি মোড়া বেডিং, বাঁহাতে টিনের সুটকেশ ও ডানহাতে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে বেচু রক্ষিত শেয়ালদা স্টেশন থেকে এবং আমাদের এই কাহিনী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কেষ্টনগরের সেই নীল ডুমো মাছিদুটো ভন-ভন করে ওড়াউড়ি শুরু করে পরস্পরকে বলল, এ আবার কোথায় এলাম রে? চল, ভালো করে আগে জায়গাটা দেখে নেওয়া যাক! এই বলে, হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে তারা বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে গেল। মাছিদুটি যুবক ও যুবতী। যুবক মাছিটি একটু চালিয়াৎ গোছের, সে বলল, বুঝেছি, এ জায়গাটায় নাম নবদ্বীপ। যুবতী মাছিনী বলল, কী করে বুঝলে?

—একবার নবদ্বীপের এক মাছিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল, ওঃ, নবদ্বীপে একেবারে...

—বুঝেছি, সেই যে-মাছিনীটাকে পেয়ে তুমি আমাকে ছেড়ে কয়েকদিন...

—আর তুমি বুঝি তখন...

—যাক, আর ভ্যানভ্যান করতে হবেনা...

যাইহোক, ওরা দুজনে উঁচু থেকে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই বুঝে ফেলল, ওরা কলকাতা শহরে এসেছে। কেষ্টনগরের আসল দুধ-ক্ষীর-খাওয়া মাছি তো, বুদ্ধি বেশ পরিষ্কার। কলকাতা শহরকে চিনতে পেরে ওরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। মাছি মাছিনীকে বলল, আর ঝগড়া করিসনি। আজ জীবনটা সার্থক হল। কলকাতা শহরের কত নাম শুনেছি, কোনদিন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম এখানে আসতে পারব? কেষ্টনগরের মিষ্টি খেয়ে-খেয়ে মুখ পচে গেছে, এখানে ওসব মিষ্টিফিষ্টির পাট নেই, এখানে খুব ভালো-ভালো নোংরা, আঁস্তাকুড় আর জঞ্জাল আছে।

মাছিনী বলল, দ্যাখো না নিচে, কত মাছি গিসগিস করছে। কত দেশ থেকে মাছি আসে এখানে—দ্যাখো, রাস্তাঘাট একেবারে ভরা!

কিন্তু নিচে নেমে এসে দেখল, একটাও মাছি নেই, সব মানুষ। মাছি দুটো খুব মুশকিলে পড়ল, সারা শহরে আর একটাও মাছি নেই, এমনকী মশা কিংবা পিঁপড়ে এইসব ছোটো জাতের প্রাণীও নেই। সব মানুষ। কলকাতার আকাশে মাত্র এই দুটো মাছি, অনেক লোক ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটা বাচ্চা ছেলে বলল, বাবা, ও দুটো কি চড়ুই পাখির বাচ্চা! বাবা উত্তর দিলেন, না, ওদের বলে মাছি, মফস্বল থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে বোধহয়। এই নিয়ে কাগজে একটা চিঠি লিখতে হবে তো!

সবকটা রাস্তা ধপধপে ঝকঝকে, কোথাও এক ছিটে ময়লা নেই, কোথাও

জঞ্জাল জমে নেই, মাছিদুটো পড়ল মহামুশিকলে। ঝাড়ুদারেরা অনবরত রাস্তা সাফ করছে, ধুয়ে দিচ্ছে, নোংরা জমবার কোন সুযোগই নেই। এ কি আর কেষ্টনগর, ময়রার দোকানের সামনের ভাঙা ভাঁড়গুলোতে যা রস জমে থাকে তাতেই কত মাছির সংসার চলে যায়। ঝাড়ুদাররা দিনে মাত্র দুবার ঝাঁট দেয় কী না-দেয়। আর এ কলকাতা শহর, এখানে প্রত্যেক দোকানে কাচের বাক্স দিয়ে জিনিশপত্র ঢাকা, প্রত্যেক বাড়ির লোকেরা মুখ-বন্ধ টিনের বাক্সের মধ্যে ময়লা জমা রাখে, মেথররা অনবরত এসে সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে যাচ্ছে।

মাছি মাছিনীকে বলল, শেষকালে কি এখানে এসে না খেয়ে মরব নাকি?

মাছিনী বলল, চল-না, মাছের বাজারে যাই, সেখানে তো মাছের কানকো নাড়িভুঁড়ি ফেলবেই।

ঘুরতে ঘুরতে এল মাছের বাজারে। মাছের বাজার ধোয়া-সাফ, কিচ্ছু নেই, মাছ ওলা মেছুনীরা বসে-বসে কীর্তন গাইছে খোল করতাল বাজিয়ে। নিরাশ মাছিনী সঙ্গী মাছিকে বলল, আম-জামের সময় হলে রাস্তায় অন্তত দু-একটা আমের খোসা ঠিকই পড়ে থাকত। ক্ষিদে পেয়ে মাছির শরীর দুর্বল হয়ে গেছে, তার গলার আওয়াজ এখন ভনভনের বদলে পিনপিন, সে বলল, এ-শহরকে কিছু বিশ্বাস নেই। তাও হয়তো সঙ্গে-সঙ্গে পরিষ্কার করে ফেলে। আমের সময় না হোক, কলার তো সময়! রাস্তায় একটাও কলার খোসা দেখলি?

—সত্যিই এ শহরের লোকেরা কলা খায় না নাকি?

—খাবে না কেন? বোধহয় খোসাশুদ্ধু খায়!

—মাছিদের জন্য একটু দয়ামায়াও নেই!

ঘুরতে-ঘুরতে এল একটা বিরাট বাড়ির সামনে, যাকে বলে, রাইটার্স বিল্ডিং! মাছি-মাছিনী একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে, ভালো-ভালো ময়লার বদলে ওরা এখন থুতু-কফ খেতেও রাজি। সেখানে গিয়েও ওরা অবাক। মাছি মাছিনীকে বলল, হ্যাঁরে, কলকাতার বদলে কি আমরা ভুল করে বিলেতে চলে এলাম? মাছিনী বলল, সত্যি মানুষগুলো এমন নিষ্ঠুরও হয়! রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কোথাও একছিটে ময়লা নেই, দেয়ালে পানের পিক নেই, সিঁড়ির পাশে সিকনি নেই, আলুর দমের ঝোল মাখানো একটি শালপাতাও নেই পর্যন্ত। ঝকঝকে তকতকে সবকিছু, লোকগুলো নিঃশব্দে কাজ করে মাঝে-মাঝে উঠে থুতুটুতু ফেলার জন্য বারান্দায় গিয়ে থুক না-করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকছে, আবার বেরিয়ে এসে সযত্নে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এরা কি মানুষ? মানুষ এমন হৃদয়হীন হয়?

মাছি বলল, চল, এখানকার মানুষেরা কিছুতেই ময়লা থাকতে দেবে না

বুঝেছি। দেখি কোথায় এমন জায়গা আছে কিনা—যেখানে মানুষ নেই, সেখানে যদি আপনি-আপনি ময়লাটয়লা কিছু থাকে। কিন্তু কলকাতার লোক এমন বোকা নয় যে, ফাঁকাজায়গা রাখতে দেবে। কোথায় মানুষ নেই? মাঝে-মাঝে পার্কময়দান তাও মানুষ দখল করে রেখেছে, সব জায়গা মানুষ বসে-বসে পাহারা দিচ্ছে, যাতে কেউ কিছু নোংরা না-করে ফেলে।

নাঃ মাছিদুটো ভাবল, মানুষকে আর বিশ্বাস নেই। এবার জন্তুজানোয়ারের খোঁজ করা যাক। হ্যাঁরে এ-শহরে কি বেড়ালছানা মরেনা? কুকুর গড়িচাপা পড়েনা? তাদের মরা দেহগুলো কোথায় যায়? রাস্তায় একটাও তো নেই! মোষের গাড়ির মোষের কাঁধে ঘা পর্যন্ত নেই, ব্যাপার কী? মাছি মাছিনীকে বলল, বুঝলি, এসবই আমাদের না-খাইয়ে মারবার ষড়যন্ত্র।

মাছিনী বলল, চল, প্রাণ থাকতে-থাকতে এ শহর থেকে পালাই। আমাদের কেষ্টনগর এর থেকে ঢের ভালো ছিল!

এইজন্যই এ শহরে মিষ্টি বন্ধ করেছে, বুঝলি? যাতে আর কোন জায়গা থেকে মাছি না আসে! মিষ্টির গন্ধ পেলে দেশ-বিদেশ থেকে মাছি তো আসতই!

—মিষ্টি কে চাইছে? একটু পচা জঞ্জালও রাখতে নেই আমাদের জন্য। চারপাশের এত বড়-বড় বাড়ি মাঝখানে একটু ফাঁকা মতন জায়গা। ভালো করে ওরা লক্ষ করে দেখল, ঠিক ফাঁকা নয়, ছোট-ছোট ঘরের মতন। মাছিনী আহ্লাদে বলল, চল, ঐখানে যাই, ঐ ছোট-ছোট ঘরগুলো নিশ্চয়ই মানুষের নয়, ওখানে জন্তুরা থাকে। জন্তুরা তো নিজেদের ময়লা লুকোতে পারবেনা।

ওপর থেকে নিচে নেমে এল আবার। কোথায় জন্তু-জানোয়ার? একটা বস্তি —এখানেও মানুষ। আর কী আদর্শ বস্তির আদর্শ মানুষ। পরিষ্কার নিকানো ঘরগুলো, অনেক ঘরের সামনে আবার আল্পনা দেওয়া, পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া, নর্দমা দিয়ে যে-জল বইছে, তা পর্যন্ত পরিষ্কার। ছোট-ছোট ছেলেরা পর্যন্ত নাকের সিকনি ফেলে রাস্তা নোংরা করার বদলে নিজের সিকনি নিজেই খেয়ে ফেলছে!

—মাছিনী, আজ আর বাঁচার আশা নেই!

—এই নাকি কলকাতা? এই শহরের এত নামডাক? দূর-দূর...

—গুজব! মাছি সমাজে যে বলে কলকাতা একেবারে স্বর্গের মতন, যেখানে-সেখানে ময়লা-নোংরা ছড়ানো, এবার বুঝলি তো, সব গুজব! কলকাতা না-দেখেই কলকাতা সম্বন্ধে যত গল্প! বিলেত না-গিয়েই বিলেতফেরত।

বিকেলের দিকে মাছিদুটো একেবারে করপোরেশনের অফিসে গিয়ে উপস্থিত। স্বয়ং নগরপালের ঘরে গিয়ে তাঁর নাকের সামনে ভন-ভন করতে

লাগল। নগরপাল আঁতকে উঠে বললেন, কী? আমার শহরে মাছি? তাজ্জব কাণ্ড! কে কোথায় আছিস?

একদল লোক ছুটে এল, সবাই মিলে তাড়া করতে লাগল, মাছিদুটোকে। কোথা থেকে দুটো উটকো মাছি শহরে ঢুকে পড়েছে, এই নিয়ে কলকাতার নামে কলঙ্ক রটে যাবে। কাল না এ-খবর আবার কাগজে বেরিয়ে যায়। মারো, মারো!

মাছিদুটো কিন্তু ভয় পেয়ে বেরিয়ে গেলনা। নগরপালের কাছাকাছি উড়তে লাগল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় ওরা একেবারে মুমূর্ষু, সারাদিন কোথাও একটু বসারও জায়গা পায়নি, গায়ের সেই চিক্কণ নীল রং মলিন হয়ে গেছে, গলার আওয়াজ প্রায় শোনাই যায়না, ওরা মরীয়া হয়ে নগরপালের মুখের সামনে ঘুরে-ঘুরে কাতরভাবে অভিযোগ জানাতে লাগল, অন্যায়। এ আপনার অন্যায়, বিদেশ-বিভুঁই থেকে দু-একটা পোকা-মাছি এখানে বেড়াতে এলে—তাদের জন্য আপনি কোন ব্যবস্থাই রাখেননি? শহরের কোন একটা জায়গায় অন্তত একটুখানি ময়লা তাদের জন্য রাখা উচিত ছিল। সারা শহর ঘুরে দেখলাম, কোথাও একছিটেও ময়লা নেই। এ আপনার অন্যায়। আমাদের সেরে ফেলতে চান। এরকম করলে কলকাতায় বেড়াতে আসবে কী করে, আ? আমরা আর কতখানি খাব, অন্তত একরত্তি ময়লাও যদি রাখতেন—

১৫

জামাটা পিঁজে গেছে, কলারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আঁশ, কাঁধের পাশে সামান্য ফাটতে শুরু করেছে, ডানহাতের কনুইয়ের কাছটায় একবার শেলাই করা, তবু জামাটা ফেলতে মায়া হয়। নীল-শাদায় ডোরাকাটা জামাটার বয়েস পাঁচ বছর পূর্ণ হল, এবার ওকে তোরঙ্গের নিচে নির্বাসন দেবার কথা, কিংবা আগামী বছরের দোল খেলার জন্য জমিয়ে রাখা, কিংবা বাসনওয়ালীদের রুক্ষ হাতে সমর্পণ করলেও হয়, কিন্তু কিছুতেই জামাটাকে বিদায় দিতে আমার ইচ্ছে করেনা, নরম মোলায়েম স্পর্শ দিয়ে সে আমার শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে। ডায়িং-ক্লিনিং-এ পাঠালে পাছে ওর সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, তাই আমি ওকে নিজেই সাবধানে বাড়িতে কেচে নিই। এখন শীতকাল কোট বা সোয়েটারের নিচে পরলে ওর ছেঁড়া অংশ আর তেমন চোখে পড়েনা, কিন্তু বুকের কাছাকাছি থাকে।

জামাটাকে বিসর্জন দেওয়া মানেই তো কত স্মৃতি নষ্ট করা। অনেক জামাকাপড়ের মধ্যে কোন একটার প্রতিই অনেকসময় বেশি মায়া পড়ে। গত

পাঁচ বছরে আমার কত জামা ছিঁড়ল, হারাল—কিন্তু এই নীল-শাদায় ডোরাকাটা জামাটাই আমার প্রাণের বন্ধু।

মনে পড়ে পাঁচ বছর আগে নতুন এই জামাটা কিনে দুমকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। রামপুরহাট থেকে বাসে যাবার পথে প্রথম শীতের অবসন্ন আলোর সন্ধ্যায় কোন একটা কারণে হঠাৎ আমার খুব মন খারাপ হয়ে যাবার পর চোখে পড়েছিল ছোটোখাটো দু-চারটে পাহাড় অবোলা জন্তুর মতন রাস্তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি হিমালয় অভিযাত্রী সংঘের সদস্য কোনদিনই হবনা, কিন্তু প্রায়ই আমার কোন পাহাড় চূড়ায় উঠতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে কোন পাহাড়ের শিখরে একা উঠে উড়িয়ে দিই আমার নিজস্ব পতাকা। সেদিন হাতের কাছেই অতগুলো চমৎকার শান্তশিষ্ট পাহাড় দেখে আমার খুব লোভ হচ্ছিল। এই নীল-শাদা ডোরাকাটা জামাটাকে আমি সেদিন পতাকা করে উড়িয়েছিলাম।

সেই বাসে চারজন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী ছিল। কী ঝকঝকে কথা আর খুনসুটি হাসি তাদের, কার না ইচ্ছে হয় ওদের সঙ্গে একটু ভাব জমাতে, সংক্ষিপ্ত প্রবাসের দিনগুলো রঙ্গরসে ভরাতে। কিন্তু আমি হেরে গেলাম, যেমন অনেক খেলাতেই হেরে যাই। বাস ছাড়ার আধঘন্টার মধ্যে একটি মেয়ের ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল, আমি শশব্যস্তে সেটা তুলে দিয়ে ভূমিকা পর্যন্ত সেরে রেখেছিলাম, মেয়েটি আমার দিকে মৃদু হেসে বলেছিল, ধন্যবাদ। আরও আড়াই ঘন্টা একসঙ্গে যেতে হবে—মাঝপথে ওদের জন্য চা এনে দিয়ে কিংবা অন্য কোন ছলে ওদের সঙ্গে আলাপ জমাবার পরিকল্পনায় মশগুল ছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি হেরে গেলাম। মেয়ে চারটি তাদের কাচভাঙা কণ্ঠস্বরে প্রেসিডেন্সি কলেজ, লেকে সাঁতারের ক্লাব, নিউ মার্কেটে কোন-কোন চিত্রাভিনেত্রীকে নিয়মিত দেখা যায়, —এইসব আলোচনায় বিভোর হয়েছিল। আমি মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিলাম, ওদের মুখের রেখায়, হাসির ভঙ্গি, শাড়ির ভাজ—এবং মেয়েদের আরও যা-যা দেখার শুধু তাই দেখছিলাম, তখন জানলার বাইরে তাকাইনি, পাহাড় কিংবা জঙ্গল দেখিনি, প্রকৃতি দেখার সময় ছিলনা। চোখের সামনে জ্যান্ত প্রকৃতি থাকতে কে আর বনজঙ্গল দেখতে চায়। হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন তার হাতের কব্জি তুলে বলল, ইস, ঘড়িটা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে। অনুরাধা, তোর ঘড়িতে কটা বাজে রে?

চারটি মেয়েরই হাতে ছোট জুলজুলে ঘড়ি, কিন্তু দেখা গেল চারজনের ঘড়িতে চাররকম সময়। তাই তো স্বাভাবিক! ওরা তন্বী, ওরা যুবতী ও সৌভাগ্যবতী—ওরা চারজনই আলাদা-আলাদা সময় ভোগ করবে—তাই তো স্বাভাবিক! কিন্তু ওরা সঠিক সময় জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওরা সময় নিয়ে কলহ করে কালহরণ করতে লাগল। অনুরাধার ধারণা তার ঘড়িটাই ঠিক, কিন্তু রুচিরা বলছে তার ঘড়ি

রেডিও মেলানো। পারমিতার দৃঢ় বিশ্বাস তার ঘড়ি কখনো এক সেকেন্ডও শ্লো-ফাস্ট হয়না—আর দময়ন্তীর ঘড়ি তো থেমেই আছে—ধুক্ ধুক শব্দও নেই। মোটমাট ওদের পরস্পরের ঘড়িতে পাঁচ থেকে আধঘণ্টা সময়ের তফাৎ। শেষ পর্যন্ত কার ঘড়িতে ঠিক সময়—তা জানার জন্য ওরা পরস্পরের মধ্যে বাজি রাখল। রুচিরা বলল, অন্য কারুর ঘড়িতে দ্যাখ তাহলে কটা বাজে।

মেয়েদের সবচেয়ে কাছের সীটে আমি বসে আছি। আমার ফুলহাতা নীল-শাদা ডোরাকাটা জামাটায় কব্জি পর্যন্ত বোতাম-আঁটা। ওরা আমার দিকে আলতোভাবে তাকিয়ে পরোক্ষে প্রশ্ন করল, কটা বাজে? কিন্তু আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই, আমি ঘড়ি হাতে দিইনা। সময়কে অত নিখুঁতভাবে জানার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আলোর যেমন সাতটা রং, সেইরকম ভোর, সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধে, রাত্রি, গভীর রাত্রি—এই সাতটা বেলা আমি খালিচোখে দেখতে পাই—এতেই আমার কাজ চলে যায়। কিন্তু মেয়েগুলোর সঙ্গে আলাপ করব এই তো সুযোগ। ঘড়ি নেই শুনলে ওরা কি আর আমায় পাত্তা দেবে? আমার বেশভূষা দেখে ওরা ধরেই নিয়েছে আমার যখন চোখ, কান, নাক সবই ঠিক আছে—তখন হাতে ঘড়িও আছে—তাই তো থাকে। সুতরাং আমি স্মার্ট হবার জন্য বললাম, আপনাদের ঘড়ির সময়গুলো যোগ করে চার দিয়ে ভাগ দিন—তাহলেই ঠিক সময় পেয়ে যাবেন।

মেয়েদের কোন উত্তর দেবার সুযোগ না-দিয়েই আমার পাশের সীট থেকে একজন যুবা বলে উঠল—এখন ঠিক চারটে বেজে সাতচল্লিশ! যুবকটি আস্তিন গোটানো কব্জি উঁচু করে ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে ধরেছে—ঘড়িটার চেহারাই এমন ইম্প্রেসিভ যে দেখলেই মনে হয়—ওরকম ঘড়ি ভুল সময় দিতে পারেনা। যুবকটি তবুও তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, কী রে বরুণ, তোর ঘড়িতে কটা বাজে? সঙ্গী উত্তর দিল, ঠিক ঐ চারটে বেজে সাতচল্লিশই। রুচিরা সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, দেখলি, বলেছিলাম-না, আমারটাই—

যুবক দুজনের নিখুঁত পোশাক, চুল ও জুতো সমান ঝকঝকে এবং ওদের হাতে সঠিক সময়। ওরাই জিতে গেল। যুবক দুজনের একজন ঐ মেয়েদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, আপনি কি প্রশান্তর বোন? সেই মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে উদ্ভাসিত মুখে বলল, হ্যাঁ, আপনি আমার দাদাকে চেনেন বুঝি? যুবকটি বলল, হ্যাঁ, চিনি, মানে আপনার দাদার এক বন্ধু আমার খুব বন্ধু, সেই হিসেবে একবার...আমার বন্ধুর নাম সিদ্ধার্থ মিত্র। রুচিরা বলে উঠল, ও, সিদ্ধার্থদা? হ্যাঁ, হ্যাঁ—

সব মিলে যাচ্ছে। এরপর আর কথার অভাব হয়না—যুবকদুটির সঙ্গে মেয়ে চারটি প্রচুর ভাব বিনিময় করতে লাগল। আমি একেবারে হেরে গেলাম। আমার

টিলা। মন খারাপ হলেই প্রকৃতিকে বেশি ভালো লাগে সন্দেহ নেই। মেয়ে চারটিকে ক্রমশ আমার অসহ্য লাগতে লাগল—মনে হল, হালকা প্রগলভা, ফচকে মেয়ে সব-—সময়ের মর্ম বোঝেনা—তবুও হাতে ঘড়ি পরা চাই। আর ক্রমশই আমি পথের পাশের নীরব দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলাম।

বাস থামল এক জায়গায়। চা খেতে নেমে আমি কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম, এরপর আরও বাস আছে? সে বললে অনেক-অনেক। সেই বাসটা যখন আবার ছাড়ল—আমি আর তাতে উঠলামনা।

আস্তে-আস্তে পথ ছেড়ে মাঠের মধ্যে হাঁটতে লাগলাম। লাল কাঁকর মেশানো জমি, সজনে আর মহুয়া গাছ এদিক-ওদিক ছড়ানো। নির্জনতা এখানে গগনস্পর্শী। কাছেই একটা খুব ছোট পাহাড়, পাহাড় নয়, টিলা কিংবা ঢিবিও বলা যায়—আমি সেটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

মনের ভেতরটা বিষম ভারী, বিষণ্ণতা আর অভিমান চাপ বেঁধে আছে! সেই নির্জন প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে মনে হল যেন সারা জীবনটাই বঞ্চিত হয়ে গেছি। অথচ কী জন্য? বাসের মধ্যে চারটি ঝকঝকে মেয়ে আমার সঙ্গে কথা না বলে আর-দুজনের সঙ্গে কথা বলেছে, সেইজন্য? অসম্ভব অবাস্তব এই বিষণ্ণতা—সামান্য একটা জিনিশও না-পেলে—সারা জীবনের সমস্ত না-পাওয়া দুঃখ এসে ভিড় করে।

টিলাটার পাথরগুলো খাড়া এবং মসৃণ—একটাও গাছ বা লতা নেই। কিন্তু খাঁজ রয়েছে অনেক, বেশি উঁচুও নয়। একবার সামান্য পা পিছলে ধাক্কা খেতেই ধারাল পাথরের খোঁচায় কনুইয়ের কাছে জামাটা ছিঁড়ে গেল। ইস, নতুন জামা। আর-একটা দুঃখ বাড়ল। যুক্তিসংগতভাবে পর্যাপ্তভাবে আজ আমার মন খারাপ করার সময়।

কিন্তু টিলাটার ওপরে যখন উঠে দাঁড়ালাম, সব বদলে গেল। বুকের মধ্যে একধরনের নিঃসঙ্গতা আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিঃসঙ্গতা এত বিশাল যে তার রূপ অন্যরকম। টিলার ওপর দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, সাঁওতাল পরগনার আকাশ ও প্রান্তর। দূরের গ্রামে দু-চারটি ফুটকি-ফুটকি আলো—এ ছাড়া পাতলা জল মেশানো ছাইরঙে ভরে গেছে দশদিক। টিলার ওপর আমি একা দাঁড়িয়ে—কিন্তু একটুও নিঃসঙ্গ মনে হলনা। মনে হল এই পাহাড় এই আকাশ ও ভূবিস্তার—এই বুনো ঝিঁঝির ডাক ও হাওয়ার খেলা—এসবই যেন আমার। আমি এদের সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারি। আমি জীবনে অনেক খেলায় হেরে গেছি—কিন্তু

[redacted] পাহাড় জয় করেছি। এই পাহাড়চূড়ায় আমার পতাকা উড়িয়ে দিতে হবে। পকেটে একটা রুমাল পর্যন্ত নেই, আমি তখন আমার নীল-শাদা ডোরাকাটা জামাটা খুলে পতাকার মতন উড়িয়ে আপন মনে বলেছিলাম, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা বড়ো মধুর। যে যাই বলুক, নানান দুঃখকষ্ট মিলিয়ে বড়ো আনন্দেই বেঁচে আছি। হে সময়, আমাকে আর-একটু সময় দাও।

১৬

শিলচর থেকে লামডিং পর্যন্ত, এরকম খারাপ ট্রেনলাইন ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ছোটো ট্রেন, অনিয়মিত চলাচল, কামরাগুলো যেমন নোংরা তেমনি অস্বাস্থ্যকর, আর ভিড়ের কথা না-বলাই ভালো। ঝাঁসি থেকে কানপুর আসার সময় প্রায় এইরকম দুঃসহ ট্রেনযাত্রার অভিজ্ঞতা আমার একবার হয়েছিল, কিন্তু আসামের ট্রেনের অবস্থা আরও খারাপ।

তবে, শিলচর থেকে লামডিং পর্যন্ত এমন অপূর্ব সুন্দর পথ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সমতলভূমি ছাড়িয়ে পাহাড়ের রেঞ্জে এসে ঢোকার পর ট্রেনের কামরা থেকে একবার বাইরে তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করেনা। দুপাশে কী আদিম অন্ধকার বন, মনে হয়, ঐসব পাহাড়ি জঙ্গলে কোনদিন কোন মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি, সভ্যতার জন্মের আগে থেকে ঐসব জঙ্গলে অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে। দুর্দান্ত সরল স্বাস্থ্যবান পাহাড়ি নদী, নামও তার কীরকম, ঝাটিংগা। বেশ আস্তে-আস্তে চলে ট্রেন, অসংখ্য ঝর্নার ওপর ব্রিজ, মাঝে-মাঝে ছোট্ট-ছোট্ট স্টেশন। নিরভিমান ছিমছাম স্টেশন, পাহাড়ের গায় খাপ খাইয়ে নিয়েছে, একটি বা দুটি লোক ওঠে নামে। স্টেশনের নাম এইরকম—হারাংগাজাও। এইসব শব্দ শুনলেই বুকের মধ্যে রোমাঞ্চ হয়।

আমরা পাঁচ বন্ধু মিলে হাফলং যাচ্ছিলাম। ট্রেনের কামরায় এত ভিড় যে বসবার জায়গা তো দূরের কথা, ভালো করে দাঁড়াতেও পারছিনা সোজা হয়ে। সবজায়গায় মালপত্র ঠাসা, তারই মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ নারী, এমনকী দুজন খুনী আসামী পর্যন্ত—পুলিশ তাদের হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরাও যে কত জাতের—বাঙালি, অসমিয়া, পাঞ্জাবি, মারোয়াড়ি, মাদ্রাজি আর আঠারো রকম পাহাড়ি জাত। দরজার কাছে মেঝেতে মালপত্র পেতে তার ওপর বসে আছে পাঁচটি খাসিয়া যুবতী, গাঢ় উজ্জ্বল রঙের স্কার্ট-পরা, হাতে চওড়া ব্যান্ডের ঘড়ি, চোখে সানগ্লাস—দেখলে ভারতীয় বলে মনেই হয়না, অনেকটা স্প্যানিশদের মতন লাগে।

আসামে ট্রেনে চাপলে একবার-না-একবার নিজের দেশের কথা মনে হবেই। এতরকমের চেহারা, এতরকমের জাত ও ভাষা অথচ সবাই এক দেশের মানুষ, এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। একথাও মনে হয়, এদের সবাইকে কে এক করে মেলাবে? মেলাবার কোন মূলমন্ত্র কি সত্যি আছে? রেলের কামরায় প্রায় কেউই কারুর সঙ্গে কথা বলেনা—কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। বিশেষত পাহাড়ের মানুষরা সমতলভূমির মানুষদের বিশ্বাস করেনা। কারণও আছে তার। তার একটা প্রমাণ আমি নিজেই দেখলাম।

আসামের প্রায় সর্বত্র রাইফেল হাতে মিলিটারির আনাগোনা। এমনকী ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকালে মাঝে-মাঝে চোখ পড়ে, দারুণ নির্জন পাহাড়ি জঙ্গলে ঝর্নার ওপর কোন সেতুর পাশে সাব-মেশিনগান হাতে একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে! স্যাবোটাজের ভয়। ঐ সৈনিকটির জন্য মায়া হয়, ওর মতন নিঃসঙ্গ আর কি কেউ আছে?

ট্রেনের কামরাগুলোতেও মিলিটারির অভাব নেই। তাদের জন্য আলাদা রিজার্ভড কম্পার্টমেন্ট তো রয়েছেই, সাধারণ যাত্রীকামরাতেও তাদের আনাগোনা। রাইফেল কাঁধে একজন বিশাল চেহারার পাঞ্জাবি সৈনিক আমাদের কামরায় ঘুরছিল, হঠাৎ সে আমাদের সামনের একটি পাহাড়ি যুবককে এসে বলল, তোমার মালপত্র কোথায়? খুলে দেখাও।

আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, যুবকটি বসবার জায়গা পেয়েছিল। ছিপছিপে চেহারার সুদর্শন তরুণ, বয়েস তেইশ-চব্বিশ, সে নাগা কী লুসাই কী খাসিয়া কী কাছাড়ি তা চেনার ক্ষমতা আমার নেই। তার হাবভাব ইওরোপীয় ধরনের, তার পোশাক, গায়ের রং আর শরীরের গড়ন দেখলে ভারতীয়ের বদলে স্প্যানিশ বা কোন ল্যাটিন জাত বলেই মনে হয়, শুধু হয়তো নাকের উচ্চতায় একটু তারতম্য হবে।

যুবকটি বলল, তার সঙ্গে একটি সুটকেশ ও বেডিং আছে। কিন্তু অনেক মালপত্তরের নিচে চাপা-পড়া, এখন বার করা মুশকিল। কথাটা মর্মে-মর্মে সত্যি, তা আমরাও বুঝতে পারছিলাম। অত ভিড়ে সব মালপত্র একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, হঠাৎ কিছু একটা বার করা সত্যিই দারুণ ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার।

সৈনিকটি তবু কঠোরভাবে বলল, না, খুলে দেখাও।

যুবকটি তখন পকেট থেকে তার পরিচয়পত্র বার করল। সে কী একটি সরকারি চাকরি করে—এটা দেখেও আশা করি তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

সৈনিকটি বলল, ওসব জানিনা, মালপত্র দেখাও।

—আমি যে-স্টেশনে নামব সেখানে প্ল্যাটফর্মে যদি খুলে দেখাই তাহলে হবে?

—না, এক্ষুনি দেখাতে হবে।

যুবকটির মুখে তখন রাগ, ঘৃণা না অভিমান—কিংবা তিনটেই মেশানো। কিন্তু

সে ধৈর্য হারালনা। অতিকষ্টে সে তার সুটকেস ও বেডিং টেনে বার করল, খুলল। আমরাও উঁকি মেরে দেখলম, তার সুটকেসে নিছক প্যান্টশার্ট থরে-থরে সাজানো, এছাড়া একটি অর্ধ-সমাপ্ত মদের বোতল ও একটি বাইবেল। নিষিদ্ধ কিংবা ভয়াবহ কিছুই নেই। তবু সৈনিকটি ছাড়লনা, তার বেডিংও খোলালো, সেখানে শুধু বিছানা। সৈনিকটি তখন চলে গেল অন্যদিকে।

ব্যাপারটা আমাদের সবারই খারাপ লেগেছিল। আমি যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ আপনার বাক্স-বিছানা খুলতে বলল কেন?

সে কোন উত্তর না-দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। তার ঠোঁটে একটা তেজি অবজ্ঞার ভঙ্গি। সে আমাদের আত্মীয় মনে করেনা।

তবু আমার কৌতূহল গেলনা। আমি তখন ভিড় ঠেলেঠুলে পাঞ্জাবি সৈনিকটির কাছে গিয়ে নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনি ঐ লোকটির বাক্সবিছানা খুলে দেখাতে বললেন কেন?

আশ্চর্যের ব্যাপার, সৈনিকটি যা উত্তর দিল, তাও খুব অযৌক্তিক নয়। সে বলল, বুঝতেই পারছ, সামরিক দিক থেকে আসামের গুরুত্ব কতখানি! কেউ কোন বন্দুক-পিস্তল বা এক্সপ্লোসিভ নিয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটা চেক করতে হয়।

—আর কারুকে না করে শুধু ঐ ছেলেটিকেই বললেন কেন?

—ট্রেনের সমস্ত যাত্রীর সমস্ত মালপত্র তো আর সার্চ করা সম্ভব নয়। তাই বেছে-বেছে হঠাৎ এক-একজনকে বলতে হয়—যাতে অন্যরাও ভয় পেয়ে যায়।

—কিন্তু পাহাড়ি ছেলেটিকেই শুধু বললেন কেন? আমাকেও তো বলতে পারতেন!

—তারও কারণ আছে। বিদ্রোহী নাগা আর মিজোদের মতন অন্য কোন পাহাড়ি জাতও হঠাৎ হয়তো হঠকারীভাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করতে পারে। সেইজন্য আমাদের সবসময় চেক করতে হয়।

সৈনিকটির যুক্তির সারবত্তা আছে। কিন্তু ঐ পাহাড়ি ছেলেটির দিক থেকে? সে নির্দোষ। সে ভাবল, তার নিজের দেশে তার ইচ্ছেমতন চলাফেরার স্বাধীনতা নেই। অথচ অন্য প্রদেশের লোকেদের আছে। একজন বাঙালি বা মাদ্রাজি আসামে যেমন খুশি ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু আসামের আদি অধিবাসী হয়েও তাকে পুলিশের হাতে হয়রান হতে হবে। ঐ পাঞ্জাবি সৈনিকটি—যার সঙ্গে তার চেহারায়, ব্যবহারে, ভূষায় কোন মিল নেই—তাকে সে কখনো নিজের দেশবাসী এবং বন্ধু বলে মনে করতে পারবে—এরপর?

যাকগে, আসামের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাব, সাববান মাথা আমার নয়। ও নিয়ে দিল্লির লোকেরা মাথা ঘামাক।

হাফলং-এ গিয়ে পৌঁছলাম আমরা। ছবির মতন সুন্দর জায়গা, ভারি নির্জন।

কলকাতার মানুষ কলকাতা ছেড়ে বেশিদিন কোথাও থাকতে পারেনা—তবু দু-একটা জায়গায় গেলে মনে হয়, এখানে সারা জীবন থেকে গেলে মন্দ হয়না! নিছক মনে হওয়াই যদিও। হাফলং সেইরকম জায়গা।

তবে, হাফলং-এর স্থানীয় অধিবাসিরা ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে মেশেনা। দূরে-দূরে পাহাড়ে গরীব পার্বত্যজাতিদের গ্রাম, শহরের লোকেরা সবাই প্রায় খ্রিস্টান, ইংরেজি পোশাক ও ভাষা, ইওরোপীয় ধরনের জীবনযাত্রা। তাদের সঙ্গে যেচে কথা বলতে গেলে, তারা ভদ্র আড়ষ্টতায় দু-একটা উত্তর দেয়, তারপর এড়িয়ে যায়। কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়না। প্রায়ই মনে হয়, বিদেশের কোন শহরে এসেছি। দু-চারটে বাঙালির দোকান আছে অবশ্য, তবে সেরকম দোকান তো বিলেতেও আছে।

এক বিকেলে আমরা বন্ধুরা বেড়াতে-বেড়াতে একটু দূরে চলে গেছি। হঠাৎ বৃষ্টি এল। বৃষ্টি মানে কী, সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার, বৃষ্টির বদলে আকাশের জলপ্রপাত বললেও হয়! দিক-দিগন্ত ভাসিয়ে দিচ্ছে বৃষ্টিতে।

কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই, একটা বন্ধ দোকানঘরের সামনে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, তবু বৃষ্টির ছাঁট আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। আধঘণ্টা একঘণ্টা কেটে গেল, তবু বৃষ্টির সেই সমান তোড়। এভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়না।

অনেকক্ষণ বাদে, দূরে বৃষ্টির মধ্যে রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে একটি মেয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখলাম, একটি যুবতী পাহাড়ি মেয়ে, স্কার্ট-পরা, রূপসীযোগ্য অহংকারী মুখভঙ্গি। সে আমাদের দিকে একবারও তাকালনা, আমাদের পাশ দিয়ে বেঁকে গেল একটা রাস্তায়, বোঝা যায়, কাছেই তার বাড়ি।

আমাদের এক বন্ধু বেপরোয়া হয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে ইংরেজিতে বলল, দ্যাখো, আমরা একদম ভিজে যাচ্ছি, তোমাদের বাড়িতে একটু বসতে দেবে?

মেয়েটি প্রথমে কথাটা বুঝতে না-পেরে ভুরু কুঁচকে বলল, কী? তারপর আবার শুনে বলল, ইয়েস অফকোর্স!

নিছক বিলিতি ভদ্রতা। কোন আন্তরিকতা নেই, বিখ্যাত ভারতীয় আতিথ্যের কোন ব্যাপার নেই। আমরা ছুটতে-ছুটতে মেয়েটির সঙ্গে তাদের বাড়ির বারান্দায় উঠলাম। একজন বৃদ্ধ লোক কঠোর মুখ নিয়ে বেরিয়ে এল, মেয়েটি তাকে নিজেদের ভাষায় কী বলে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। বৃদ্ধটি আমাদের রীতিমতো জেরা করল কিছুক্ষণ, তারপর বারান্দায় বসবার অনুমতি দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চ পাতা। সেখানেও বসে স্বস্তি নেই, রীতিমতো জলের ঝাপটা লাগছে। যদিও তখন মে মাস, বেশ শীত করতে শুরু করেছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম, বারান্দার পরেই ওদের ড্রয়িংরুম, সেখানে রীতিমতো সোফা-কৌচ পাতা, যিশুখ্রিস্টের মূর্তি। পুরো বাড়িটাই বিলিতি ধরনের। আমাদের

চেহারা খুব একটা হাড়-হাভাতের মতো নয়—তবু আমাদের ভেতরে বসতে দেওয়া হলনা।

খানিকটা বাদে একটি যুবক এল বাড়ির ভেতর থেকে, আবার আরেক প্রস্থ জেরা। বৃষ্টি তখন আরও বেড়ে উঠেছে।

শেষপর্যন্ত আমাদের ভেতরের ঘরে বসতে দেওয়া হল বটে, কিন্তু কোন আন্তরিকতা নেই। চা-ফা খাওয়ানো তো দূরের কথা। আমরা মনে-মনে বলতে লাগলাম, আমরা কোন দোষ করিনি, আমাদের পূর্বপুরুষরা যত দোষ করেছে, তার জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি, আমাদের বন্ধু হিসেবে নাও।

কিছুই হলনা, ওরা আমাদের বিশ্বাস করেনা।

১৭

কীরকমভাবে তালা খুলতে হয়? তালা খোলার মাত্র দুরকম স্বাভাবিক উপায় আছে। বন্ধ তালার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে নির্দিষ্ট চাবি বার করে টুক করে খুলে ফেলা। অথবা যদি চাবি হারিয়ে যায়, তবে ছোটো তালা হলে, ডানহাতের মুঠোয় তালাটাকে চেপে ধরে—কব্জিতে সমস্ত জোর এনে কট করে ভেঙে ফেলা উচিত। আর, তালাটা যদি বেশ বড়ো হয়, একটা লোহার রড তালাটার মধ্যে ঢুকিয়ে মটাং করে ভেঙে ফেলা যায়। তালা খোলার এই দুই রীতি।

কিন্তু অনেক মানুষ দেখেছি যারা এরকম সহজ পথে যেতে চায়না। ঘন-ঘন তালার চাবি হারিয়ে ফেলে বড় বেশি ব্যস্ত আর উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তালাটাকে ভাঙার কথা মনেও পড়েনা। আশেপাশের বাড়ির সকলের কাছ থেকে চাবির থোকা নিয়ে আসে। হয়তো, জড়ো হল পঞ্চাশটা চাবি, প্রত্যেকটা পরের চাবি এক-এক করে চেষ্টা করা হচ্ছে নিজের তালায়। এতে কখনো তালা খোলে, আমার বিশ্বাস হয়না। তবে শুনেছি, কারুর-কারুর ক্ষেত্রে খুলে যায়। কেউ-কেউ আরও উৎকট কাণ্ড শুরু করে দেয়। তালার ছোটো গর্তের মধ্যে একটা ছোটো পেরেক কিংবা লোহার তার ঢুকিয়ে খুব কায়দায় নাড়াচাড়া শুরু করে। এতেও নাকি তালা খোলা সম্ভব।

ছেলেবেলা বিশ্বনাথ নামে একটি ছেলের কথা শুনতাম—যে নাকি চাবি হারানো তালায় পেরেক ঢুকিয়ে অনায়াসে খুলতে পারত। সে ছিল পরোপকারী ছেলে, কারুর বাড়িতে এরকম তালাসংকট হলে ডাক পড়ত বিশ্বনাথের।

একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সত্যিই তুমি পেরেক ঢুকিয়ে তালা খুলতে পার?

—হুঁ! লাজুক হেসে বিশ্বনাথ বলেছিল।

—যে-কোন তালা?

—হুঁ।

তখন আমি ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করি, সে-তালাগুলো পরে আবার লাগানো যায়? ঠিক-ঠাক থাকে?

—নাঃ! তা আর যায় না। খারাপ হয়ে যায়।

—আশ্চর্য! যদি খারাপই হয়ে যায় তবে তুমি অত কষ্ট করে খুলতে যাও কেন? ভেঙে ফেললেই তো হয়। সেটাই তো সোজা।

—কী করব, সবাই যে খোলাতেই চায়। কেউ ভাঙতে চায় না। দেখবেন, সকলের বাড়িতে দু-চারটে তালা থাকে—যেগুলো দেখতে ঠিকই আছে, কিন্তু ভেতরের কলকব্জা খারাপ। তাছাড়া, আমারও প্রত্যেকবারই মনে হয়, এবার বোধহয় না-খারাপ করেই খুলতে পারব।

এ-জীবনে কার না দু-একবার তালার চাবি হারিয়েছে? চাবির মতো সামান্য জিনিশ কখনো-কখনো হারাতে বাধ্য। চেনাশুনোদের মধ্যে, যারা ব্রাহ্মণ—তাদের দেখেছি, পৈতের সঙ্গে চাবি বেঁধে রাখে সযত্নে। তাদেরও চাবি হারায়। অতিসাবধানীদের বারবার হারায়।

আমার একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে, যখন কোন নতুন নারীপুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয়, মনে-মনে আমি যখন তাদের চরিত্র ও স্বভাবের পরিমাপ করি, তখন প্রথমেই ভাবি, এর যদি কখনো চাবি হারিয়ে যায়, কী উপায়ে খোলার চেষ্টা করবেন? ভেঙে ফেলা, পাশের বাড়ি থেকে চাবির থোকা চেয়ে আনা, না বিশ্বনাথের মতো কারুকে ডেকে পেরেক নাড়াচাড়ার কৌশল—জানতে আমার খুবই ইচ্ছে হয়। অথচ, মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারিনা। প্রথম পরিচয়ে অনেককিছু জিজ্ঞেস করা যায়—কোথায় চাকরি, অমুকের সঙ্গে চেনা আছে কিনা। বাড়ির সামনের রাস্তায় জল দাঁড়ায় কিনা, প্রেসিডেন্ট জনসনের বুদ্ধি সম্পর্কে তাঁর কী মত, সর্ষের তেল পাওয়া গেলেও আর বাদাম তেলের অভ্যেস ছাড়া উচিত না অনুচিত—এসবই জিজ্ঞেস করতে পারি—কিন্তু সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটা কিছুতে জিজ্ঞেস করতে পারিনা—চাবি হারিয়ে গেলে আপনি কী করেন? অথচ এ প্রশ্নের উত্তর জানা নাহলে, একটা লোকের চরিত্র সম্পর্কে আমার কিছুই জানা হয়না, সবসময় আমি বিষম অস্বস্তি বোধ করি।

চাবি খোলার চরিত্র দেখে মানুষ চিনতে আমার ভুল হয়না। বিশ্বনাথের ছোটবেলা থেকেই আমার দুশ্চিন্তা ছিল। ওর পরোপকারী সরল মুখ দেখে আমার

ভয় হতো, বুঝতে পারতাম বিশ্বনাথ ভুল করছে। আর আমার ছোটোমাসি? আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তিনিই প্রথম এম-এ পাস মেয়ে। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমন খুশির হৈ-হল্লা করতে ভালোবাসতেন ছেলেবেলায়, অর্থাৎ আমার ছেলেবেলায়,—উনি তখন কলেজে পড়েন। ছোটোমাসির একটা চামড়ার সুটকেস ছিল—তার মধ্যে যে কী অমূল্য সম্পদ থাকত জানিনা। কিন্তু প্রায়ই সে সুটকেসের তালার চাবি হারাত। আমি দাদামশাইয়ের বাড়িতে যেতাম মাঝে-মাঝে—গিয়েই শুনতাম, ছোটোমাসি চাবি হারিয়ে বাড়ি মাথায় করেছেন। জামাকাপড় ছড়িয়ে বইপত্র এলোমেলো করে ছোটোমাসি চাবি খুঁজছেন। সে চাবি যে পাওয়া যাবেনা সকলেই জানে—কোনদিন পাওয়া যায়নি। আমাকে দেখলেই বলতেন ছোটোমাসি, এই নীলু, চট করে তালাটা ভেঙে দে তো।—ছোটো টিপ-তালা, ভাঙতে এমন কিছু শারীরিক শক্তি লাগেনা। এমন অনেকবার ভেঙেছি। প্রায়ই ছোটোমাসি বাড়ি ফেরার পথে নতুন তালাচাবি কিনে আনতেন। একদিন আমি ঐরকম সময়ে উপস্থিত হয়েছি। ছোটোমাসি সাজগোজ করে কোথায় বেরুবেন, হঠাৎ চাবি খুঁজে পাচ্ছেননা। যথারীতি, আমার ওপর ভাঙার হুকুম হল। আমি তালাটা হাতে নিয়ে, ছোটোমাসির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, প্রায়ই যখন হারায়, তখন তুমি তালা লাগাও কেন?

ছোটোমাসি মুখ ভেংচে বললেন, ইস, বাক্স খোলা রাখি আর কী!

সেই মুহূর্তে ছোটোমাসির মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, ছোটোমাসি জীবনে সুখী হবেননা। কেন মনে হয়েছিল জানিনা, কিন্তু ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভয় হয়েছিল। তালা ভাঙার পর বাক্স খুলে ভেতরে কী আছে কোনদিন আমাকে দেখতে দেননি। কিন্তু, তখন আমি প্যান্ডোরার বাক্সের গল্প নতুন পড়েছি। আমার মনে হয়েছিল, বাক্স বন্ধ করে যা উনি আটকে রাখতে চাইছেন, তার নাম প্যান্ডোরার সেই 'আশা'। দুঃখদুর্দশা-কষ্ট-হতাশা আগেই বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে ওঁকে ঘিরে ধরেছে। তখন ওঁর মুখ কিন্তু বিষম হাসিখুশি থাকত।

ছোটোমাসির জীবন সুখের হয়নি। ওঁর স্বামী স্বনামধন্য পুরুষ, নিউ আলিপুরে প্রাসাদোপম বাড়ি, দেবশিশুর মতো দুটি ছেলেমেয়ে, নতুন মোটরগাড়ি। তবু ছোটোমাসিকে দেখলে না-ভেবে পারিনা—উনি জীবনে সুখ পাননি।

ছোটোমাসির এক ছেলেকে দেখতাম, প্রায়ই গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। তারপর জিজ্ঞেস করতাম, কীরে পরেশ, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পরেশ বলত, চাবিওলা খুঁজছি।

ঝনঝন শব্দে পুরোনো চাবিওলা কলকাতার রাস্তা দিয়ে যেত—বাবা প্রায়ই চাবি হারিয়ে ফেলতেন, আশেপাশের সব বাড়ির চাবি লাগিয়ে চেষ্টা করার পরও

না-খুললে, পরেশ দাঁড়িয়ে থাকত রাস্তায়। ডুপ্লিকেট চাবি বানাবে চাবিওলা ডেকে। অসীম ধৈর্য ছিল পরেশের—দাঁড়িয়েই থাকত। আমরা তখন হয়তো ক্যারাম খেলছি কিংবা টেনিসবলের গলি-ক্রিকেট, পরেশ তবু দাঁড়িয়ে। বলতাম, যা না, তালাটা ভেঙে ফেল! পরেশ যেতোনা। চাবিওলা সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরত।

জানতাম পরেশ জীবনে উন্নতি করবে। করেছে। ওর বাবার অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসায়ে পরেশ আজ মেরুদণ্ড। লক্ষ-লক্ষ টাকার খেলা করে। পাড়ার দুর্গাপুজোয় চাঁদা দেয় পাঁচশো টাকা, ঠাকুমার নামে হাসপাতালে দান করেছে একলক্ষ। ব্যাঙ্কের লকারের চাবি পরেশ নিশ্চিত হারায়না।

আর, পেরেকের কৌশল জানা বিশ্বনাথ, একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। হঠাৎ বেরিবেরিতে ওর একটা চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, অন্যচোখেও কম দেখে। হাতে চাবি থাকলেও বিশ্বনাথ আজকাল তালা খুলতে পারেনা—চোখে দেখে না বলে, চাবিটা গর্তে ঢোকাতে পারেনা।

কিন্তু এ-পর্যন্ত লিখে মনে হয় আমার ভুল হচ্ছে। হয়তো, এসব যোগাযোগ কার্যকারণহীন। মনে পড়ল, অনেকের চাবির রিঙে অনেকগুলো চাবি থাকে—কিন্তু সব চাবির তালা থাকেনা। মেয়েদের আঁচলে যতগুলো চাবি বাঁধা থাকে—সবই তালা খোলার জন্য নয়। অনেক মেয়ের নাকি তালা খোলার দরকারই নেই—এমনিই আঁচলে বা কোমরে চাবির থোকা ঝোলানো নতুন কায়দা। অনেক ছেলেও যে হাতে চাবির রিং ঘোরাতে-ঘোরাতে যায়—সেসব কিসের চাবি? আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি।

কিন্তু, আর-একটি ছেলের কথা না-বললে চলবেইনা। তার তালা খোলার স্বভাব দেখে আমি শিউরে উঠেছি। ঘরের দরজায় তালা বন্ধ, সে চাবি হারিয়েছে। সে তালা ভাঙালনা, পাশের বাড়ি থেকে চাবির গোছা চাইলনা, পেরেক ঘোরালনা। বারান্দায় একটা স্ক্রুড্রাইভার ছিল, সে তাই দিয়ে দরজার যে কড়া দুটোর সঙ্গে তালা লাগানো—সেটাই খুলতে লাগল। আমি বললাম, এ কী করছ, এ তো তালা খোলা নয়, ঘর ভাঙা!

সে বলল, কিছুই ভাঙছিনা। শুধু ঘরে ঢুকছি। দরজার কড়া-দুটো পরে আবার লাগিয়ে দিলেই হবে।

আমি বললাম, তালাটা তো তখনও লেগেই থাকবে। পরে তো ভাঙতেই হবে।

—সে পরে দেখা যাবে। এখন তো ঘরে ঢোকা যাক।

তালা না-ভেঙেও বন্ধঘরে ঢোকার যে এরকম উপায় তার মনে এল, তা দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই। ছেলেটির চরিত্র বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনা।

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com